সোনামুখী কলেজ বার্ষিক পত্রিকা

SONAMUKHI COLLEGE
ESTD-1966

প্রগতি-২০১৩

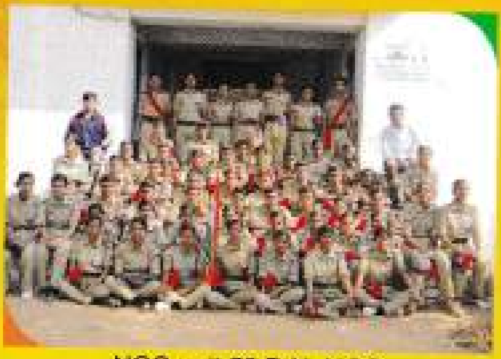

NCC unit 56 B.N. NCC

Parade

26th January stablo

26th January

Blood Donation by N.S.S. Volunteers

Blood Donation by N.S.S. Volunteers

Blood Donation by N.S.S. Volunteers

Blood Donation by N.S.S. Volunteers

সোনামুখী কলেজ বার্ষিক পত্রিকা

SONAMUKHI COLLEGE

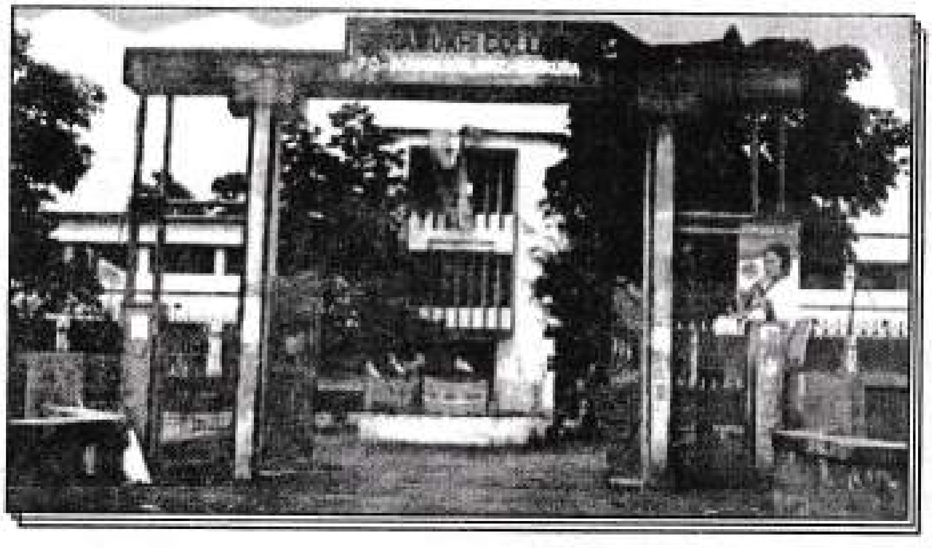

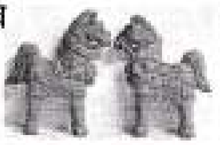

প্রগতি-২০১৩

পরিচালনায় ঃ ছাত্র সংসদ

পত্রিকা যুগ্ম সম্পাদক - পার্থ রায় ও দেবাশিষ চক্রবর্তী

পত্রিকা যুগ্ম সহঃ সম্পাদক- দেবব্রত ঘোষ ও পরিমল ঘোষ

প্রগতি-২০১৩

প্রকাশক : ডঃ বিজয়কৃষ্ণ ভাণ্ডারী
অধ্যক্ষ, সোনামুখী মহাবিদ্যালয়
সোনামুখী, বাঁকুড়া, পিন-৭২২২০৭

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর, ২০১২

পত্রিকা কমিটি : অধ্যাপক ইন্দ্রজিৎ দাস (তত্ত্বাবধায়ক)
অধ্যাপক মইনুল হক
অধ্যাপিকা আসরফি খাতুন
পার্থ রায় ও দেবাশিষ চক্রবর্ত্তী (পত্রিকা সম্পাদক)
দেবব্রত ঘোষ ও পরিমল ঘোষ (পত্রিকা সহঃ সম্পাদক)

পত্রিকা সদস্য/সদস্যা : কৌশিক পাঁজা
সোমনাথ ঘোষ
সেখ কুতুব উদ্দিন মল্লিক

পরিকল্পনা ও অলঙ্করণ : অনিরুদ্ধ নায়েক ও
রিন্টু ঘোষ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : অধ্যাপক সুবীর চৌধুরী, ডঃ বাপ্পাদিত্য মণ্ডল,
অধ্যাপক রাতুল সাহা।

পরিচালনা : ছাত্র সংসদ

প্রচ্ছদ অলঙ্করণ : ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

অক্ষর বিন্যাস ও মুদ্রণ : শ্রীমা প্রিন্টার্স, সোনামুখী, বাঁকুড়া।
মোঃ-৯৮৫১৪৪০১২৫

SONAMUKHI COLLEGE

P.O.-Sonamukhi, Dist.-Bankura, PIN-722 207 (W.B.)

From :

DR. BIJAY KRISHNA BHANDARI

Principal

FROM PRINCIPAL'S DESK

It is pleasure to learn that PRAGATI-2013, the Annual Patrika of Sonamukhi College, *is going to be published soon. I scrounge in my communicative repertoire, not too replete with richness of words for the expression of my feeling regarding such a beautiful creation.* Pragati *is the result of the combined literary efforts of my Students and Collegues, teaching and non-teaching. Complementing them is superfluous as they are the mainstay of the College in every sphere.*

The world has become quicker, and mankind is going through catastrophic mutual distrust, hence as it may be my swan-song in regard to Pragati and related activities in my College as Principal I like to urge them all to be more exacting in quest of real peace and harmony.

(B.K. Bhandari)
PRINCIPAL
Sonamukhi College

সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন

বহু প্রতীক্ষার পর প্রকাশিত হল আমাদের সকলের প্রিয় পত্রিকা 'প্রগতি' ২০১৩। প্রগতি মানে এগিয়ে চলা, প্রগতি মানে উন্নতি, প্রগতি মানে উন্নয়নের ফুটন্ত নতুন সকাল, প্রগতি মানে জমকালো অন্ধকারকে ঘুচিয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র।

কিন্তু বর্তমান সময়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেশের অর্থনৈতিক দুর্বলতা, দারিদ্রতা, বিদেশী শত্রুর আক্রমণ, দেশের রাজনৈতিক হানাহানি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, কৃষি-বাণিজ্য-শিল্প সব দিক থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গোটা দেশ।

তাই আজ যারা উন্নয়নকে একটা গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রেখে লুটেপুটে খেতে চাইছে -- সেই ধান্দাবাজী, পুঁজিপতিদের উন্নয়ন স্তব্ধকারীদের কালো হাত ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে চাই -- আর এই অন্ধকারের বৃত্ত থেকে আলোর ফুটন্ত সকালকে ছিঁড়ে আনার শপথ নিতে হবে ছাত্রসমাজকে।

ছাত্র সমাজ চাই উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প সবদিক দিয়েই। স্কুল থেকে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় -- সব ক্ষেত্রে শিক্ষাকে আরো গুণগতভাবে মান বাড়াতে ও প্রসার বাড়াতে। সঠিকভাবে পরিচালনা, জ্ঞান অর্জন এবং শিক্ষার আলোকে প্রসারিত করা।

আমরা চায় ছোটো ছোটো শিশু পাঠশালা থেকে ইংরাজী শিক্ষা অর্জন করুক। আর এই ইংরাজী শিক্ষাকে যারা পূর্বে বন্ধ করে রেখেছিলেন, পাঠশালাতে- ছাত্রসমাজ তাদের ক্ষমা করবে না।

আগামী দিনে আমাদের কলেজও বিশ্ববিদ্যালয়, জেলা, রাজ্য গোটা দেশে আমাদের এগিয়ে থাক উন্নতির শিক্ষায়-- এই প্রত্যাশা রাখছি আমাদের প্রগতি পত্রিকায়। কলেজ ছাত্র সংসদের বাৎসরিক পত্রিকা প্রকাশ করতে পেরে আমরা যেমন গর্বিত তেমনই কলেজের পঠন পাঠনের দাবী আমাদের ক্ষেত্রেও।

জাতীয়তাবাদী গৈরিক অভিনন্দন সহ-

বিশ্বজিৎ মাজি

সাধারণ সম্পাদক

ক্রীড়া সম্পাদকের প্রতিবেদন

কিছুদিন আগে পেরিয়ে যাওয়া শারদোৎসব ও দীপাবলীর মধুর স্মৃতি এখনও আমাদের মনে। অবশেষে প্রত্যেক বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও প্রকাশিত হল আমাদের কলেজের সকলের প্রিয় বাৎসরিক পত্রিকা 'প্রগতি' - ২০১৩। শারদোৎসব ও দীপাবলীর মধ্যবর্তীকালে কাশ, শিউলি পথের শুভ্র আঁচল বিছিয়ে লক্ষ্মীদেবীকে বরণ করে নিয়েছি, ঠিক সেই রকম আমাদের প্রিয় পত্রিকা 'প্রগতি' কলেজের সকলের হাতে তুলে দিতে প্রস্তুত।

পশ্চিমবাংলার জনগণ এক সুন্দর, সাধারণের মা, মাটি মানুষের সরকারকে এনে দিয়েছে। সে সরকার মাত্র কয়েক মাসেই শিক্ষা, খেলাধূলা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে রাজ্যকে সঠিক স্থানে পৌঁছে দেবার লক্ষে। যা বিশ্ববাসীর কাছে দেশের সম্মান বাড়িয়েছে।

যদিও বর্তমান শতাব্দীতে খেলাধূলা পেশাদারিত্বের কবলে পড়ে কিছুটা পিছিয়ে তবুও আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে খেলাধূলার মানকে উন্নয়নমুখী করা।

প্রত্যেক বছরের মতো এ বছরেও আমরা ছাত্র সংসদ কলেজের খেলাধূলার মান উন্নয়নে বিশেষ দৃষ্টান্ত রেখেছি। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাথে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অত্যন্ত নিষ্ঠা ও উৎসাহের সাথে পরিচালিত হয়েছিল। কলেজের ছাত্রছাত্রী অত্যন্ত উৎসাহের সাথে প্রতিযোগিতাগুলিতে অংশগ্রহণ ও শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মীবৃন্দের সহযোগিতায় সর্বাত্মক সফল ও সার্থকভাবে সম্পন্ন হয়। ছাত্রছাত্রীদের জন্য ছিল প্রচুর ইভেন্ট সাথে সাথে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দদের জন্য ছিল বেশ কিছু আকর্ষণীয় ইভেন্ট। এ বছরও আমাদের কলেজ নিষ্ঠার সঙ্গে কলেজ ক্রিকেট টুর্ণামেন্টে অংশগ্রহণ করে। সেখানে শেষমেশ পরাজিত হলেও তারা খুব ভালো খেলেছিল। এছাড়া এ বৎসর অন্তঃবিভাগের ক্রিয়া প্রতিযোগিতায় ছিল ছাত্রছাত্রী উভয়ের ক্যারম প্রতিযোগিতা। যা সত্যই ছিল আকর্ষণীয়।

বর্তমানে খেলাধূলার মান উন্নয়ন করতে হলে আমাদের সকল স্তরের মানুষকে খেলাধূলার প্রতি আগ্রহী হতে হবে। খেলাধূলার পাশাপাশি দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ের মান উন্নয়ন করতে সকলকে প্রয়াসী হতে হবে। যাই হোক, এখানে আমার কলম সমাপ্ত করলাম। জয় হিন্দ। বন্দে মাতরম্।

জাতীয়তাবাদী গৈরিক অভিনন্দন সহ-

যুগ্ম সম্পাদক - **তাপস রজক ও ইন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী**

যুগ্ম সহ সম্পাদক - **পথিক ডাঙ্গর ও রাজু সিকদার**

ছাত্র-ছাত্রী কল্যাণ উপসমিতি সম্পাদকের প্রতিবেদন

প্রত্যেক বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও অবশেষে প্রকাশিত হল আমাদের প্রত্যেকেরই বহু আশাদীপ্ত কলেজ পত্রিকা 'প্রগতি' ২০১৩। সেবা-ই হল পরম ধর্ম। শিব জ্ঞানে জীব সেবা-ই পরম তৃপ্তি। বিগত বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও আমরা ছাত্র সংসদের তহবিল থেকে ছাত্রদের যথাসাধ্য সাহায্য করেছি। আমাদের কলেজে পড়তে আসা বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী কৃষিজীবী খেতমজুর গরীব পরিবারের। সেইসব ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি ও ফর্ম ফিলাপের যথেষ্ট পরিমাণ টাকা থাকে না। গত বৎসরের মতো এবৎসরও আমরা ভর্তি ও ফর্ম ফিলাপের সময় ৬৪,৪০০ টাকা ছাত্র-ছাত্রীদের AID FUND দিয়ে সাহায্য করেছি।

দিবা বিভাগ--	৩৩,৩০০-০০ টাকা
প্রাতঃ বিভাগ -	৩১,১০০-০০ টাকা
মোট-	৬৪,৪০০-০০ টাকা

এছাড়া গত বৎসরের মতো এবারেও দিবা বিভাগে ৪৩২ জন ও প্রাতঃ বিভাগে ৩২৪ জনকে কলেজে অর্ধ বেতনে পড়ার সুযোগ করে দিয়েছি। ভবিষ্যতে একই রকমভাবে ও আরো ভালোভাবে ছাত্রছাত্রীদের পাশে ও সাথে থাকতে পারি এবং তাদেরকে যথাসাধ্য সাহায্য করতে পারি এবং সোনামুখী কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরো সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারি সেই জন্য গরীব ছাত্রছাত্রীদের একনিষ্ঠ সমর্থন আমাদের পরিচালিত ছাত্র সংসদের উপর থাকবে এই আশা রাখি।

পরিশেষে পত্রিকার মাধ্যমে কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সকল ছাত্রছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনার সাথে সাথে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

'জগতে সর্বদা দাতার আসন গ্রহণ করো,
সর্বস্ব দিয়ে যাও আর ফিরে কিছু চেয়ো না।'

জাতীয়তাবাদী গৈরিক অভিনন্দনসহ--

দিবাবিভাগ

যুগ্ম সম্পাদক-**অনিরুদ্ধ নায়েক ও রিন্টু ঘোষ**
যুগ্ম সহ সম্পাদক - **লোকনাথ লাহা ও প্রণব সরকার**
সদস্য-**সুমন ঘোষ, শঙ্খদীপ ব্যানার্জী।**

প্রাতঃবিভাগ

যুগ্ম সম্পাদক-**সেখ সাহেব ও প্রদীপ বাড়ুই**
যুগ্ম সহ সম্পাদক -**পরিমল ঘোষ ও তাপস পাল**
সদস্য/সদস্যা -**উত্তম পাল, কুশল ঘোষ, প্রিয়া ঘোষ, বেলা মুর্মু।**

সাংস্কৃতিক সম্পাদকের প্রতিবেদন

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন লেখার শুরুতেই প্রথমেই জানাই আমার শ্রদ্ধা, ভালোবাসা সকলকে, আমরা খুশি প্রগতি পত্রিকাটি প্রকাশ করতে পেরে।

"সাংস্কৃতিক" বিষয়টি খুবই জটিল। সংস্কৃতি অর্থাৎ Culture সংগীত হতে পারে, নৃত্য হতে পারে, কলাকৌশল বা মেধা হতে পারে। তাই বিষয়টি আমাদের কাছে যথেষ্ট যত্নের ও সম্মানের।

আমরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে থাকি।

এছাড়া কলেজে আমরা সরস্বতী পুজা, ১৫ই আগষ্ট, ২৩শে জানুয়ারী, ২৬শে জানুয়ারী, ৫ই সেপ্টেম্বর গভীর শ্রদ্ধার সাথে পালন করি। সকল ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত থেকে আমাদের সহযোগিতা করে।

প্রত্যেকবার আমরা নবাগত ছাত্র-ছাত্রীদের বরণ করে নেওয়ার জন্য নবীন-প্রবীন মিলন উৎসব পালন করি। যা কলেজের মানকে অনেকখানি বৃদ্ধি করে। প্রবীন থেকে নবীন, গ্রাম থেকে শহর সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠান মাতিয়ে দেয়।

প্রত্যেক বছর স্পোর্টস এবং গেমস্-এ কলেজ পার্শ্ববর্তী ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় যা খুবই চমকপ্রদ হয়ে ওঠে। এবং পরিশেষে আমরা একটি বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকি। তাতে বিভিন্ন চলচ্চিত্র খ্যাতনামা শিল্পীরা অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। ২০১৩-র এই বৎসরও বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন চলচ্চিত্রের হাস্যকৌতুক বিখ্যাত অভিনেতা, অভিনেত্রী ও গায়ক ও গায়িকা।

পরিশেষে বলি সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

সংস্কৃতি আমাদের গর্ব, সংস্কৃতি আমাদের অহংকার, আমাদের গৌরব সুতরাং কৃষ্টি; সংস্কৃতির হাত ধরে পশ্চিমবাংলার উন্নয়ন হবেই হবে -- এই আশা রাখে ছাত্র সমাজ।

জাতীয়তাবাদী গৈরিক অভিনন্দন সহ-

যুগ্ম সম্পাদক -প্রদীপ বাড়ুই ও কাশিনাথ পাঁজা।

যুগ্ম সহ সম্পাদক - সুশোভন বিশ্বাস ও রিন্টু ঘোষ।

পত্রিকা সম্পাদকের প্রতিবেদন

সুধী,

পত্রিকা সম্পাদকীয় কলমে লিখতে গিয়ে বারবার তাদের ছবি ভেসে ওঠে যারা আজ আমাদের মধ্যে নেই। প্রিয়জনদের হারানো অব্যক্ত কোনো ব্যথার চেয়েও ব্যথাতর ও হৃদয়বিদারী। পশ্চিমবঙ্গের বহু মানুষ সন্ত্রাসের গ্রাসে চলে গিয়েছে। তাপসী মালিক, সুতাপা দাস, দেবযানীর রক্ত যেন আজও তাজা। নন্দীগ্রামের গণহত্যার কর্ণবিদারী চিৎকার আজও বাংলার সমস্ত আকাশে বাতাসে। তাদের বিচারের বাণী আজও নীরবে কাঁদে। যারা চলেগেছে মৃত্যুর কোলে, যাদের আর ফিরে পাব না তাদের অমর আত্মার প্রতি জানাই শুভেচ্ছা ও তাদের পরমাত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

এরপর সোনামুখী কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, ভাইবোন, দাদা-দিদি, সহপাঠী ও প্রতিটি কলেজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গকে জানাই শুভেচ্ছা ও জাতীয়তাবাদী গৈরিক অভিনন্দন। বিগত বৎসরের মতো এ বৎসরও আমাদের কলেজের বহু আকাঙ্খিত বার্ষিক পত্রিকা 'প্রগতি' ২০১৩ নিয়ে সকল সকল ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের মনে জায়গা করে নিতে এই মহান কাজে ব্রতী হয়েছি। অতীতে সকলের সহযোগিতা ও সহমর্মিতাকে পথের দাবী করে সাফল্য লাভ করেছি, এবারও তার পূর্ণ মর্যাদা দিতে আমরা চেষ্টাবান। কলেজ পত্রিকা শিক্ষার এক অন্যতম কাজ হিসাবে বিবেচিত হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের বহু সুপ্ত প্রতিভার প্রকাশ ঘটে কলেজে এই পত্রিকার মাধ্যমে। ছাত্র-ছাত্রীদের তাদের নিজ নিজ ভাবনা লেখনীর মাধ্যমে এই পত্রিকায় প্রকাশ পায়। যাতে তাদের ভবিষ্যতের কবি, সাহিত্যিক ও উজ্জ্বল প্রতিভার পূর্বাভাসের বার্তার বাহক হয়ে ওঠে। যাদের সুন্দর লেখা কলেজের এই পত্রিকাকে সমৃদ্ধ করেছে তাদেরকে অকপটে লেখকের আসনে স্বীকার করা শ্রেয়। কবিতার সাথে সাথে প্রবন্ধ, গল্প ইত্যাদি সাহিত্যের নানা সম্ভারের মহামিলন ক্ষেত্র হল এই কলেজ পত্রিকা। এই কলেজের পত্রিকা আমাদের কাছে সত্যই গুরুত্বপূর্ণ। তাই তার মানোন্নয়নে যথেষ্ট সচেষ্ট হয়েছে শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ। তাই অনেক লেখাকে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকগণদের বাতিলের খাতায় ফেলতে হয়েছে। যার জন্য আমরা ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকে ক্ষমাপ্রার্থী।

কলেজের শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রতিযোগিতামূলক বিভিন্ন বিষয়ের তথ্যসূত্র হল এই বার্ষিক পত্রিকা। ছাত্রছাত্রীদের বহু আকাঙ্খা থাকে এই পত্রিকার উপর। যার মাধ্যমে তারা বৎসরান্তে সংসদের নেতৃত্বে কলেজের উন্নয়নমূলক সুসংবাদ জানাতে পারে। এই পত্রিকা থেকেই বোঝা

যাবে যে কলেজ কোন সত্য সুন্দরের চর্চা করছে; আলোকের কোন দিশায় সঠিক পথে পরিণতির লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। যা কলেজের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে উল্লেখ্য ভূমিকা বহন করবে। কিছু ব্যক্তির ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, তারা মনে করেন যে দল ছাত্র সংসদের ভূমিকায় থাকে তাদের প্রচার ভূমিকা হল এই পত্রিকা, কিন্তু এ ধারণা নিতান্তই ভুল। আমাদের এই পত্রিকাতে দলাদলির কোন ভূমিকা নেই। কলেজের প্রতিটি সদস্যের এই পত্রিকায় অবাধ স্বাধীনতা, দায়িত্ব ও সম্মান একাকার। যা আমরা সানন্দে নিয়েছি যা ধ্রুব সত্য। আপনারা পত্রিকা প্রকাশের যে গুরুদায়িত্ব আমাদের দিয়েছিলেন তা কতটা পালন করতে পেরেছি তার বিচার করার দায়িত্ব আপনাদের হাতেই দিলাম। পত্রিকায় যদি কোন ত্রুটি থাকে তার জন্যে আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

পরিশেষে কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মীবৃন্দদের জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ছাত্রছাত্রীদের জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

জাতীয়তাবাদী গৈরিক অভিনন্দনসহ--

যুগ্ম সম্পাদক - **পার্থ রায় ও দেবাশিষ চক্রবর্ত্তী**

যুগ্ম সহ সম্পাদক-**দেবব্রত ঘোষ ও পরিমল ঘোষ**

> ''অন্তরের জিনিসকে বাহিরের, ভাবের জিনিসকে ভাষার, নিজের জিনিসকে বিশ্বমানবের এবং ক্ষণকালের জিনিসকে চিরকালের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ।''
>
> -- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সোনামুখী কলেজ পরিচালন সমিতি

১। সভাপতি	মাননীয় শ্রী অরূপ চক্রবর্ত্তী সভাধিপতি, জেলা পরিষদ-বাঁকুড়া
২। সম্পাদক	ডঃ বিজয়কৃষ্ণ ভাণ্ডারী অধ্যক্ষ, সোনামুখী কলেজ
৩। রাজ্য সরকারী প্রতিনিধি	শ্রী মিহির কুমার মুখার্জ্জী
৪। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি	ডঃ সেখ সিরাজুদ্দিন
৫। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি	অধ্যাপক বৈবস্বত ভট্টাচার্য্য
৬। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি	অধ্যাপক কল্পনা মিত্র
৭। শিক্ষক প্রতিনিধি	ডঃ স্বপন কুমার সামন্ত
৮। শিক্ষক প্রতিনিধি	ডঃ পার্থসারথি দে
৯। শিক্ষক প্রতিনিধি	ডঃ বাপ্পাদিত্য মণ্ডল
১০। শিক্ষাকর্মী প্রতিনিধি	শ্রী নিখিল কুমার দে
১১। শিক্ষাকর্মী প্রতিনিধি	শ্রী দেবাশীষ বিশ্বাস
১২। সাধারণ সম্পাদক, ছাত্র সংসদ	শ্রী বিশ্বজিৎ মাজি

Iron nerves with a well intelligent brain, and the whole world is at your feet.

—Vivekannanda

LIST OF THE COLLEGE STAFF

- **Principal :**

Dr. Bijay Krishna Bhandari M.Sc., B.Ed. (Sc), Ph.D.

TEACHING STAFF (DAY SHIFT)

- **Dept. of Bengali :**

1. Dr. Asrafi Khatun	M.A., B.Ed.,Ph.D.	Asstt. Professor
2. Sk. Moinul Haque	M.A.	Asstt. Professor
3. Smt. Sumana Sanyal	M.A.	Asstt. Professor
4. Sri Amar Patra	M.A.	Asstt. Professor

- **Dept. of English :**

1. Dr. Dharmadas Banerjee	M.A.,Ph.D.	Associate Professor
2. Sri Indranath Mukherjee	M.A.	Part-time Teacher
3. Sri Salil Bhuin	M.A.	Part-time Teacher

- **Dept. of Sanskrit :**

1. Sri Kajal Pal	M.A.	Part-time Teacher
2. Smt. Purnima Shit	M.A.	Part-time Teacher
3. Sri Achintya Adhikari	M.A.	Part-time Teacher

- **Dept. of Political Science :**

1. Sri Indrajit Das	M.A.	Associate Professor
2. Sri Dipak Kumar Neogi	M.A.	Associate Professor
3. Smt. Swagata Chakraborty	M.A.	Part-time Teacher

- **Dept. of Philosophy :**

1. Smt. Sudhamoyee Kumar	M.A.,M.Phil.,B.Lib.Sc.	Associate Prefessor
2. Smt. Jayeeta Kundu	M.A., B.Ed.	Part-time Teacher
3. Sri Ashok Dhani	M.A., B.Ed.	Part-time Teacher

- **Dept. of History :**

1. Sri Asim Konar	M.A.,B.Ed.	Part-time Teacher
2. Sri Ashoke Ghosh	M.A.,B.Ed.,M.Ed.	Part-time Teacher
3. Smt. Sreema Pal	M.A.,B.Ed.	Contractual Teacher

- **Dept. of Economics :**

1. Dr. Bipul De	M.Sc.,M.Phil.,Ph.D.,P.G.D.H.E.	Assistant Professor
2. Sri Ratul Saha	M.A.,B.Ed.	Assistant Professor

- **Dept. of Commerce :**
  1. Dr. Swapan Kumar Samanta M.Com.,B.Lib. Sc.,Ph.D. Associate Professor
  2. Dr. Subir Kumar Chowdhury M.Com.,Ph.D., Assistant Professor
  3. Dr. Arun Kumar Roy M.Com, M.Phil., Ph.D.Associate Professor
  4. Dr. Chhotelal Chouhan M.Com., M.Phil.,B.Ed.,Ph.D. Assistant Professor
- **Dept. of Physics :**
  1. Dr. Bappaditya Mandal M.Sc., Ph.D. Assistant Professor
- **Dept. of Chemistry :**
  Guest Faculty Members.
- **Dept. of Botany :**
  1. Dr. Parthasarathi De M.Sc.,Ph.D.Associate Professor
  2. Dr. Dipak Kr. Hens M.Sc., Ph.D. Assistant Professor
  3. Dr. Sunita Mukhopadhyay M.Sc.,M.Tech., Ph.D. Assistant Professor
- **Dept. of Zoology :**
  1. Dr. Subhrakanti Sinha M.Sc., Ph.D.Associate Professor
  2. Sri Biplab Banerjee M.Sc. G.L.I.
  3. Smt. Sumana Kaviraj M.Sc., B.Ed. Part-time Teacher
- **Dept. of Mathematics :**
  1. Sri Joydeb Mondal M.Sc.Associate Professor
- **Dept. of Geography :**
  1. Sri Susanta Chand M.A. Part-time Teacher

NON - TEACHING STAFF (DAY SHIFT)

Class-III Staff

1. Sri Debabrata Chatterjee -- Head Clerk
2. Sri Partha Sarathi Roy -- Accountant
3. Sri Rabisankar Siddhanta -- Cashier
4. Sri Haradhan Dey -- Lab. Inst. (Non-grad.)
5. Sri Nikhil De -- Clerk
6. Smt. Shelly Banerjee -- Clerk
7. Sri Anisur Rahaman Mondal -- Clerk
8. Sri Santimoy Laha -- Clerk

Class-IV Staff

1.	Sri Mrityunjoy Mukherjee	--	
2.	Sri Debasis Biswas	--	
3.	Sri Pronay Sarkar	--	Lib. Peon
4.	Sri Bhairab Banerjee	--	Farash
5.	Sri Subhas Lohar	--	Sweeper
6.	Sri Nepal Dutta	--	Lab. Attendent
7.	Sri Sukumar Ghosh	--	Lab. Attendent
8.	Smt. Kunti Dom	--	Sweeper
9.	Smt. Lilabati Bhattacharya	--	Lab. Attendent
10.	Sri Pradip Nag	--	Guard
11.	Sri Lakshmi Kanta Mandi	--	Lab. Attendent

TEACHING STAFF (MORNING SHIFT)

1.	Smt. Suchandra Chetterjee	M.A.	Contractual Teacher (Philosophy)
2.	Sri Madhab Kundu	M.A.	Contractual Teacher (History)
3.	Sk. Mokbul Hoque	M.A.	Contractual Teacher (Bengali)
4.	Smt. Tanima Mohanta	M.A.	Contractual Teacher (Bengali)
5.	Sri Manojit Ghosh	M.A.	Contractual Teacher (History)

NON TEACHING STAFF (MORNING SHIFT)

1.	Sri Mohan Chandra Dutta	-	Typist
2.	Sri Ananda Das	-	Lib. Clerk
3.	Smt. Bony Roy	-	Lib. Peon
4.	Sri Madan Ram Jadav	-	Peon
5.	Sri Swapan Ankure	-	Peon

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক/লেখিকার নাম	পৃষ্ঠা
কবিতা ঃ-		
রূপসী নদী	আরিফুল মিদ্যা	১
বাসনা	উজ্জ্বল বীট	১
বিদায়	রাজেশ চ্যাটার্জ্জী	২
এই তোমায় বলছি	মহম্মদ টৌটন সেখ (আশিক)	৩
এলোপাথাড়ি	দেবশ্রী দাস	৩
রক্তের অপব্যবহার	সুশোভন বিশ্বাস	৪
মোদের ছোট্ট গ্রাম	বুলি দেয়াসী	৪
আনন্দের খোঁজে	সুমন পাত্র	৫
বিবাদ পূর্ণ-২০১২	মানসী নায়ক	৬
শারদীয়া	শ্যামলী পাত্র	৭
জীবন	জারিয়া খাতুন	৭
বসন্ত	তিলক সূত্রধর	৮
মনের ঝিলিক	স্বপন দেয়াসী	৮
টেলিফোন	বিপুল পাত্র	৮
মরা নদী	অসিত বাগ্দী	৯
শ্বশুর বাড়ি	সুশান্ত পাত্র	৯
শিক্ষার একাল	শুভম ভট্টাচার্য্য	১০
শুধু দুঃখ পেলাম	কৃষ্ণ দাস	১১
বর্ষা মানে	বিজয় নন্দী	১১
পৃথিবী	আস্তিক দেয়াসী	১২
আমার স্বপ্ন	অপর্ণা সূত্রধর	১২
রমণী	শ্রী বৈদ্যনাথ দাস	১৩
মা আসছে	প্রিয়াঙ্কা গোস্বামী	১৩
Spirit of Love	Papiya Mondal	১৪
স্বপ্ন	পাপিয়া ঘোষ	১৪
মা-মাটি-মানুষ	শান্তিময় ঘোষ	১৪
বর্তমান সভ্যতা	অভয় দাশগুপ্ত	১৫
জীবন যন্ত্রণা	তনুজা খাতুন	১৫
একদিন বুঝবে তুমি	নিমাই রুইদাস	১৬

বিষয়	লেখক/লেখিকার নাম	পৃষ্ঠা
মনের সাধ	মৌসুমী সিংহ	১৬
আমার প্রেম	ইন্দ্রজিৎ	১৭
আগমনী বার্তা	শ্রীকান্ত বাউরী	১৮
হনুমানের আবিষ্কার	শান্তনু ধাড়া	১৯
শিক্ষা	সমীর বাউরী	১৯
কল্পনার অতীত	মেঘনমা দাশগুপ্তা	২০
২৫শে ডিসেম্বর		২০
আমন্ত্রণ	হারাধন হেমব্রম	২১
আমরা সবুজ	অনুষ্টুপ কারক	২২
স্বপ্নের রঙ	অতনু গরাই	২২
ঠিকানা	রণিত দত্ত	২৩
মনের কথা	অতনু গরাই	২৩
আমি হলাম শুধুই আমি	সৌমান্ত কারক	২৩
কম্পাউণ্ডার	বিশ্বজিৎ গুহা	২৪
তোমার জন্য	কৌশিক পাঁজা	২৪
Best Friend	Sandip Gorai	২৫
প্রত্যাশা	মহম্মদ সফীউল্লা হক মল্লিক	২৬
ভালোবাসার কিছু চাওয়া	বাপ্পা মাজি	২৭
আবছা অবকাশ	তানিয়া দাস	২৭
চিরদিনের	প্রিয়া মণ্ডল	২৮
গল্প / প্রবন্ধ ঃ-		
স্বাধীনতার পরে নারী আজও পরাধীন	পৃথা গাঙ্গুলী	২৯
রাজা নামেই রাজা	অচিন্ত্য মাল	৩১
ভালোবাসা	ক্ষমা দাশগুপ্ত	৩২
জাস্ট রামায়ণ	শুভ্রকান্তি দেব	৩৪
তথ্য	সুমন রায়	৩৬
দার্জিলিং ও গ্যাংটক	বিশ্বনাথ চন্দ্র ও সুরজিৎ পাল	৩৭
মনের মানুষ	সমীর বাউরী	৩৯
কিংবদন্তী সংগীত শিল্পী মান্না দে-র স্মরণে	শঙ্কর দাস	৪১
সমরাঙ্গণে	এস. কুমার	৪২
স্বপ্ন	অপর্ণা ঘোষ	৪৩
বাঁকুড়ার সংক্ষিপ্ত পরিচয়	শান্তনু নন্দী	৪৪
মজাদার জোকস	জয় সাহা	৪৬
সোনামুখী কলেজ NCC Unit	রাতুল সাহা	৪৭

রূপসী নদী

—আরিফুল মিদ্যা
(বি.এস.সি., প্রথম বর্ষ)

গ্রামের ধারে ছোট্ট নদী নামটি তাহার শালী
শীত এলে তার জল থাকে না, থাকে শুধুই বালি
অল্প জলে অল্প টানে খেলে নানান মাছ
চাষী ভাইরা দুই তীরে তার করে নানা চাষ।
পাশের গ্রামের জেলেরা সব আঁকড়ে ধরে বাঁচে,
চাষীরাও তো কম যায় না নিয়মিত জল সেঁচে।
এমনি করে দুঃখে যখন নদীর দুচোখ ভাসে,
আশেপাশের ক্ষেতগুলো সব ফুলে, ফলে হাসে।
গ্রীষ্ম এলে নদীর কোলে উষ্ণ নরম জলে,
কাকেরা সব স্নান করে যায় আপন ডানা মেলে।
মাছরাঙারা বসে থাকে পাশে গাছে গাছে
দেখে আমার দুচোখ জুড়োয় আলতো আঁধার সাঁঝে।
বর্ষা এলেই জলের তোড়ে নদী ওঠে ফুলে,
বিঘ্ন বাধার করবে বিনাশ গর্জনেতে বলে।
কখনও বা অহংকারী আপন অহংকারে,
নীড় ভাসায়, নৌকা ডুবায়, পশু-পক্ষী মারে।
অবশেষে বর্ষ শেষে শুকিয়ে এলে জল
নতুন পলীর গন্ধ দিয়ে জোগায় চাষীর বল।
শরৎ এলে নদীর তীরে ফোটে কাশফুল,
তুলোয় সাজা তুহিন দেশে পথ হয়ে যায় ভুল।

বাসনা

— উজ্জ্বল বাঁট
(বি.এ., প্রথম বর্ষ)

ছুটব আমি সরল প্রাণে
পূর্ণ কুটির হতে।
কান জুড়াবে পাখির গানে,
সুরের মিঠে স্রোতে।
তুচ্ছ করে জোয়ার-ভাটা
এপার ওপার সাঁতার ভাঁটা,
নাচবে আলো জলের তলে
নীল আকাশের বুকে।
বর্ষা যখন ছড়িয়ে দেবে,
মাঠের কোণে দেখা যাবে।
কাঠঠোকরা ঠোঁটের ঘায়ে,
গাছের গুঁড়ির গায়ে।
সুরঙ্গটি করছে গভীর
পাখায় রঙিন মেলা।
অবাক হয়ে দাওয়ায় বসে
দেখব আমি দুপুর বেলা।

বিদায়

— রাজেশ চ্যাটার্জী
(উদ্ভিদবিদ্যা-সাম্মানিক, দ্বিতীয় বর্ষ)

হয়ত যাবে বলেই এসেছিলে
বাড়িয়েছো পা নতুন জীবনের তরে।
হাসিহাসি মুখে আজ বিদায় জানালাম
তবু, দুচোখ গিয়েছে ভরে।
মনে পড়ে পুরোনো স্মৃতি
আমার স্মৃতির সাথে।
হয়ত আর এ জীবনে তোমার
হাত আসবেনা এই হাতে।
হাজার লোকের ভিড়ের মাঝে
সেই প্রথম দেখেছিলে আমায়।
আজো, হাজার লোকের ভিড়ের মাঝে
জানিয়ে দিলে আমাকে বিদায়।
থাকতাম বসে একই সাথে।
হাতে রেখে তোমার হাত,
তোমার কথায় বিভোর হয়ে,
কাটিয়ে দিতাম সারাটা রাত।
আজ হায় তোমার হাতে
হাত রেখেছে অন্যজনে।
নিতে হবে তাই আমাকে বিদায়
এই মন ভেসেছে চোখের জলে।
মনে পড়ে আজ সেইসব দিন
মনে পড়ে কত কথা।
জানতেও চাইলে না এ মন কি চায়
বুঝতেও চাইছ না এ মনের ব্যথা।
রইবে সেই সানের পাথর
রইবে আজ সবই।
রইবে সেই গাছের ছায়া
শুধু রইবো না গো আমি।
থাকবে তুমি খুব সুখে
আনন্দে কাটবে দিন।
বিদায় ব্যথা মনে ধরে তোমায়
চেয়ে যাবো সারাটা দিন।
এ হাত আজো উঠবে শুধু
তোমার দিকে চেয়ে
এ বুকে রাখবো তোমায় জড়িয়ে ধরে
একবার যদি আসো ফিরে।
অশ্রু আজ শুধুই ঝরে
হিসাব মেলে না তাই।
দাঁড়িয়ে রইলাম পথের মাঝেই যখন,
জানিয়ে দিলে আমাকে বিদায়।
কত কথা বলার ছিল
রয়ে গেল সব মনে।
আসবে না সুখ এ জীবনে আর
দুঃখটাই রয়ে গেল এ জীবনে।
হাসব না আর আগের মতো
স্বপ্ন দেখব না আর এই মনে।
অশ্রুজলে তৃষ্ণা মেটে, মাঝরাতে
তোমায় মনে পড়ে যখন,
ভগ্নপ্রায় ধ্বংসস্তূপে আজ চিৎকার ক'রে
আমি বলে যেতে চাই।
বিদায়, ভালোবাসাহীন দূষিত সমাজ
জানিয়েদিলাম আজ তোমাকে বিদায়।।

এই তোমায় বলছি

—মহঃ টোটন সেখ (আশিক)
(ইতিহাস-সাম্মানিক, দ্বিতীয় বর্ষ)

তোমাকে ভালই লাগে,
কাচ বসানো সাদা সালোয়ারে।
শ্যাম্পু করা এলো চুলে
টবে থাকা গোলাপের
সবটুকু সৌন্দর্য যেন
তোমার চারপাশেই থাকে।
তোমাকে আরও ভালো দেখায়
ফিতে দিয়ে চুল বেঁধে।
তুমি যখন কলেজ ক্যাম্পাস পেরিয়ে
অমিতদার ক্যান্টিনে গিয়ে ঢোক
ঝালমুড়ির প্যাকেট কিনতে।
কোনো এক বন্ধ পিরিয়ডে
ছাত্রহীন কলেজের বারান্দার দিকে
তুমি যখন উদাসভাবে তাকিয়ে থাক
তখনও তোমাকে ভালই লাগে।
কিমবা, কোন এক ঝলসে যাওয়া বিকেলে
বা বৃষ্টি ভেজা সন্ধ্যায়
দোতলার বেলকনিতে দাঁড়িয়ে
তুমি শুনতে পাও পাতার মর্মর্ শব্দ
আর রেলিংএ বুক চেপে
তুমি যখন আনমনে গেয়ে ওঠো
সেই বিখ্যাত গান--
'আমারও পরানো যাহা চায়'
তখনও তোমাকে অদ্ভুত সুন্দর দেখায়।

এলোপাথাড়ি

— দেবশ্রী দাস
(বি.এ.-সাম্মানিক, দ্বিতীয় বর্ষ)

রবি করে জ্বালাতন বৈশাখ মাসেতে।
ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি আসে ফাল্গুনি বাতাসে।।
ধুপ-ধাপ গাছ ভাঙে ঝড় এলে জৈষ্ঠ্যে।
প্রজাপতি পাখা মেলে ফুলে ফুলে জড়িয়ে।।
পাখির কূজন ভরে দেয় সন্ধ্যে।
পালোয়ান ভয় পায় শীত এলে পৌষে।
কাশে কাশে দোলা লাগে শরতের আকাশে।
আশ্বিনে শারদীয়া মন নেই বাসাতে।
ভাবনার জগতে যাই আমি হারিয়ে।
চিল হয়ে যাব উড়ে পৃথিবীটা ছাড়িয়ে।।

রক্তের অপব্যবহার

— সুশোভন বিশ্বাস
(ফিজিক্স-সাম্মানিক, তৃতীয় বর্ষ)

চারিদিকে চলছে রক্ত নিয়ে খেলা--
যে দিকে তাকাই সেই দিকেই শুধু ডেডবডির মেলা।
আজ এই পার্টির কাল ওই পার্টির একটানা একটা পড়তেই হবে লাস,
তা না হলে আনন্দবাজারের প্রথম পাতার খবরটা হবে না খাস
পার্টি পার্টি পার্টি, পার্টি আর পার্টি--
এই পার্টি পার্টি করে ভাইয়ে ভাইয়ে আজ চলছে লাঠালাঠি।
ইনডিসিপ্লিন ইস ডিসিপ্লিন আজকের ভারতের নীতি,
রাজতন্ত্রই বর্তমান গণতন্ত্র এটা ইণ্ডিয়ার লোকগীতি।

মোদের ছোট্ট গ্রাম

— বুলি দেয়াশী

বড় একটা ক্ষেতের পাশে ছোট্ট একটি গ্রাম।
এই গ্রামেই থাকি আমি মির্জাপুর নাম।।
গ্রামের পাশে আছে ক্ষেত সবুজ দিয়ে ঘেরা।
ঐ সবুজ মাঠেতেই শস্য দিয়ে ভরা।।
এই গ্রামে লেগেই আছে সুখ দুঃখ হাসি।
মোদের এই গ্রামটিকে বড়ই ভালোবাসি।।
এই গ্রামেই জন্মেছিল আমার পূর্ব পুরুষেরা।
ছোট্ট মোদের গ্রামটিতে তাদের স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।।
আমাদের গ্রামটিতে আছে কয়েকটি পুজা।
পুজার সময় আনন্দেতে লাগে ভারি মজা।।
সুন্দর এই মাতৃভূমি মা গো তোমায় বড় ভালোবাসি।
জনমে জনমে যেন আমি তোমার কোলেই আসি।।

আনন্দের খোঁজে

— সুমন পাত্র
(ভূগোল-সাম্মানিক, দ্বিতীয় বর্ষ)

হঠাৎ সেদিন কাগজের ঠোঙায় দেখলাম একটা বিজ্ঞাপণ।
আনন্দ নামে কে যেন হারিয়েছে।
কেউ সন্ধান দিতে পারলে পুরস্কৃত করা হবে।
লোভ বেড়ে উঠল, বারবার পড়লাম লেখাটা
কিন্তু কত টাকার পুরস্কার! সেখানটাই যে ছেঁড়া।
তবু সেদিন থেকেই শুরু হল আমার খোঁজা
যাকে পাই তাকেই শুধুই - দেখেছ আনন্দকে?
কেউ আমার পানে চেয়ে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়।
কেউ বলে ক্ষ্যাপা।
এমনি করে প্রখর গ্রীষ্ম থেকে ফুলের বসন্ত,
ঘুরে গেলো একটি বছর।
একদিন জানাশোনার গণ্ডী পেরিয়ে, বেরিয়ে পড়লাম পথে
মায়েরা স্নান করছিল ঘাটে।
বললাম আনন্দকে দেখেছ কেউ?
দেখ ভাই নির্লজ্জ এই লোকটা
ওর যেন কে হারিয়েছে, আমরা তার কি জানি?
ত্রস্ত পায়ে চলল তারা আপন অঙ্গনে
শ্রান্ত আমি বসে ছিলাম, হঠাৎ শুনি
হরিধ্বনি খোল করতাল শ্মশান বন্ধু সবে
বিদায় দিতে এলো কে যেন কারে।
মাঝ-বয়সী বোধহয় হবে, কাঁদছিল বৌটি-
সাহস করে বললাম 'মাগো, দেখেছ আনন্দকে?
মুখখানি তার ঢাকা এলোচুলে, কান্না ব্যাকুল কণ্ঠে বললে-
এতো আমার হারিয়ে গেল আনন্দ।
দৌড়ে গিয়ে মুখের চাদর সরিয়ে দিয়ে দেখি-
দুর! এতো জরাজীর্ণ বুড়ো! এ আনন্দ সে আনন্দ নয়তো!
এ জগতে আনন্দ কতরূপে দেখছে সবাই,
মা বলে খোকা তার আনন্দ পুতলি, স্ত্রী বলে স্বামী,
প্রেমিক প্রেমিকার মাঝে ডুবে যায় আনন্দের রসে।
গদি পরে মহাজন কেমনে গুনে যায় আনন্দ সম্পদে।
কবি বলে নিরালায় কথামালা গেঁথে, হাসে কাঁদে আপন মনে।
সব ভাষা স্তব্ধ হয়ে গেল - হারিয়ে গেলাম আমি রূপের মাঝে।

বিষাদপূর্ণ ২০১২

— মানসী নায়ক
(বাংলা, প্রথম বর্ষ)

২০১২ কেড়ে নিল তাদের
ভারতবাসী হিসেবে যারা গর্বিত করেছিল মোদের।
২০১২ এসেছিল যে নুতনের বার্তা সাথে নিয়ে,
চলে গেলো সে সব হারাণোর দুঃখ দিয়ে।
চলে গেলেন সকলের প্রিয় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়,
তাঁর মৃত্যুর সাথে শেষ হল সাহিত্যের এক অধ্যায়।
সিনেমার হিরো সকলের প্রিয় গেলেন রাজেশ খান্না,
লক্ষ লক্ষ দর্শককে দিয়ে বুক ফাটানোর কান্না।
যশ চোপড়ার শেষ সিনেমা 'যব তক হ্যায় জান',
সিনেমার পরিচালক হিসেবে যিনি পেয়েছিলেন সকলের সেরা মান।
যাত্রাসম্রাট শান্তিগোপাল ছিলেন যাত্রাকার,
সাহিত্যিক হিসেবে হুমায়ুন আহমেদের সাথে তুলনা হয় কার।
পণ্ডিত রবিশঙ্কর ছিলেন সেতারের জগতের রবি,
চলে গেছেন এ.কে. হাঙ্গল উপহার দিয়ে তাঁর সেরা সেরা ছবি।
আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রাক্তন সেনানী চলে গেছেন লক্ষ্মী সায়গল,
তার বীরত্ব ও ত্যাগের কথায় চোখে আসে জল।
২০১২ চলে গেল এত অমূল্য সম্পদ নিয়ে,
সারাজীবন থেকে যাবে ২০১২ দুঃখের স্মৃতি হয়ে।

শারদীয়া

— শ্যামলী পাত্র
(বি.এ., দ্বিতীয় বর্ষ)

বাগান ভরা শেফালী টগর
মাধবী লতাও দিয়েছে খবর।
তাকিয়ে দেখি মুক্ত আকাশ
কিছু একটা দিচ্ছে আভাস।

পূজার ছুটি পূজার ছুটি
মনটা রে ভাই নাচে।
সকাল বিকাল সবখানেতেই
ময়ুর পাখী সাজে।

নতুন জামা, নতুন শাড়ি
বই এর সঙ্গে কেবল আড়ি।
ক'দিন ধরে শুধুই গাড়ি
পূজা মণ্ডপ আর বন্ধুর বাড়ি।

এত সুখেও আমরা ক'জন
হিসাব কষি সর্বক্ষণ।
কখন হবে বিসর্জন
হায় রে! আবার পড়ার আয়োজন।

জীবন

— জারিয়া খাতুন
(বি.এ., দ্বিতীয় বর্ষ)

জীবন হল আঁকা বাঁকা
লম্বা বড় পথ।
কোথাও আঁধার কোথাও আলো
কোথাও নদীর তট।।
জীবন হল গাছের ডালে
ছোট্ট ফোটা ফুল।
কখনো সে চির সঠিক
কখনো সে ভুল।।
জীবন হল গাছের শাখায়
শুকনো হলুদ পাতা।
কখনো সে ঝরা ফুল
কখনো মালায় গাঁথা।।
আসল কথা জীবন হল
শুধুই মরার জন্য।
তবু দেহ বলে 'হে প্রাণ
তোমায় পেয়ে ধন্য'।।

বসন্ত

— তিলক সূত্রধর
(বাংলা-সাম্মানিক, দ্বিতীয় বর্ষ)

শীতের জাড্য পেরিয়ে আজ বসন্তের দ্বারে এসেছি,
দু চোখ প্রকৃতির রূপলীলায় মুগ্ধ হই আমি।
এ মনের ভাবকে ফুটিয়েছে কোন কে অন্তর্যামী।
বসন্তের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি শুধু,
সাহারার বুকে জ্বলন্ত অগ্নিশিখা ধু ধু।
দেখি এর লাবণ্যরূপকে
যার দৃষ্টিপাতে ঊষর মরুভূমি সাগরে পরিণত হয়
যার অশ্রুধারা সাহারার বুকে বারি বর্ষণ করে।
বসন্তের শীহরণ জেগেছে আজ গাছেদের ডালে ডালে,
পাতায় পাতায়।
তবু, বসন্তের আহ্বানে তার শীহরণ জাগে না
অগ্নিনির্গত হয় না তার জ্বালামুখে।
তবে সে কি বসন্তের ছাপ রেখে যেতে পারবে?
সে কি দাগ টেনে দিয়ে যাবে সাহারার বুকে?

মনের ঝিলিক

— স্বপন দেয়াসী

একটি ঝিলিক একটু দেখা।
একটু খানি হাসি।।
হঠাৎ মনের জানলা খুলে।
ফোটায় ফুলের রাশি।।
যখন তোমায় পড়ে মনে।
মন হারায় যে কোনখানে।।
গন্ধে তখন মাতায় ভুবন।
মিষ্টিসুরের বাঁশি।।
ওগো আমার মনের ঝিলিক।
তোমায় ঘিরে স্বপ্ন মাণিক।।
কেন তুমি দুষ্ট এত।
হওনি তুমি মনের মতো।।

টেলিফোন

— বিপুল পাত্র
(বি.এ.-পাশ, দ্বিতীয় বর্ষ)

টেলিফোন -- টেলিফোন
কোন কাজে নেই মন,
কখনও বা মাসী পিসী, কখনও বা মামারা
বন্ধুদের ফোন এলে ছুটে যায় দাদারা।
অফিস থেকে ফোন এলে ডাক পড়ে বাবার
কেউ কি জানে না আমার ফোনের নাম্বার?
কত আশা করি আমি আমার ফোন আসবে!
আমার সাথে কথা বলে কেউ বুঝি হাসবে।
কেউ ফোন করে না আমায়, কেউ ভালোবাসেনা
সকলেরই ফোন আসে, কেন আমারই আসে না?
ফোন তুললেই বলে একে ডাক, ওকে ডাক
ফোনের আশায় আমি যেন তীর্থের কাক।

মরা নদী

— অস্মিত বাগদী

প্রথম আমি মরা ছিলাম-
জল পাইনি আগে।
একদিন আমার জীবনেতে-
'আষাঢ়' এলো নেমে।
আমার আগেই স্বপ্ন ছিল-
অনেক কিছুই নিয়ে।
তাই প্রথমে যাচ্ছি আমি-
শাল-জঙ্গল বেয়ে।
যেতে যেতে এক খালের মাঝে
পড়লাম আমি এসে।
চারিদিকে শস্য শ্যামল-
সবুজ মেলার ঘাসে।
সেখানে এক জেলে
নামল আমার কোলে।
সাঁতার কেটে উঠল আবার কূলে।
দুকুল ভরা কাশ ফুলে আর
দুকুল ভরা গাছে।
পাখিরা যেন বলছে তুমি
এত দিনে এলে।
এবার যাব কৃষক ভাই-এর ক্ষেতে।
একটি ছেলে আলের ধারে বসে,
গান গাইছে আমায় দেখে দেখে।
পড়লাম সাগরে এসে,
আমার স্বপ্ন পূর্ণ হলো
আষাঢ় মাসে।

শ্বশুরবাড়ি

— সুশান্ত পাত্র
(বাংলা-সাম্মানিক, দ্বিতীয় বর্ষ)

আর যেখানে যাও না রে ভাই
সপ্তসাগর পার,
ঘন ঘন শ্বশুরবাড়ি
যেওনা খবরদার।
শ্বশুরবাড়ি ভারী মজা
নতুন জামাই এলে,
পুরানো হলে বুঝবে রে ভাই
জামাই কাকে বলে।
প্রথম প্রথম দেখতে পাবে
সবার মুখে হাসি
তারপরেতে দেবে তোমায়
খেতে সবই বাসি।
মনে মনে ভাববে যখন
একাই ভালো ছিলাম,
কলি যুগে কেন আমি
বিয়ে করতে গেলাম?

শিক্ষার একাল

— শুভম ভট্টাচার্য্য
(ভূগোল-সাম্মানিক, প্রথম বর্ষ)

জন্মের দুই বছর থেকে শিশু আজ বইয়ের কবলে
তখন তো তার ডাকার সময় 'মা' বলে।
বছর খানেক এগিয়ে গেলে শিশু হয় বিদ্যালয়মুখি,
জীবনের প্রথম থেকেই সে অসুখী।
বয়স বাড়ে, বাড়ে ব্যাগের ওজন,
জ্ঞান না হওয়া শিশু ভাবে এই কী জীবন।
দশ বছরের শিশুকে নিয়ে শুরু হয় মা-বাবার এগিয়ে থাকার লড়াই
শিশুকে চুপ করে শুনতেদ হয় অন্যের কাছে বাবা-মার বড়াই।
শিশু থেকে কিশোর হলে শুরু হয় বাবা-মার স্ট্যাটাস রাখার পালা,
জ্ঞানপ্রাপ্ত কিশোর বুঝতে পারে জীবন কী জ্বালা।
বয়স বাড়ে, বাড়ে কিশোরটিরও সংখ্যায় প্রাইভেট টিউটর,
বছর পনেরোর শিশুর কাছে জীবন হয়ে উঠে বর্বর।
বছর পনেরো হলে শুরু হয় বাবা-মার কেরিয়ার বাছার রমরমা,
কিশোর বুঝতে পারে জীবনে নেই ফুলস্টপ, কমা।
শিশু থেকে কিশোর তখন যুবকের পথে এগিয়ে,
পিছন ফিরে চেয়ে দেখে বছর আঠারো গেছে পেরিয়ে।

"অন্তরের জিনিসকে বাহিরের, ভাবের জিনিসকে ভাষার, নিজের জিনিসকে বিশ্বমানবের এবং ক্ষণকালের জিনিসকে চিরকালের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ।"

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শুধু দুঃখ পেলাম

— কৃষ্ণ দাস
(প্রাক্তঃ বিভাগ, প্রথম বর্ষ)

জীবনে শুধু দুঃখ মাত্রই পেলাম।
একদিন, সকালে ভালোবেসে ছিলাম
ঘাসের ওপরের এক শিশির বিন্দুকে।
কিন্তু; সূর্যের দাবদাহের তেজে,
শিশির কোথায় হারিয়ে গেল জানিনা।
ভালোবাসতে 'সাধ' জেগেছিল,
একটা সুকন্ঠী কোয়েলকে।
কিন্তু; বসন্ত হারিয়ে যেতেই...............
কোয়েল হারিয়ে গেল আমার থেকে
ইচ্ছে হয়েছিল, শরতের সাদা মেঘে
একবার গভীর চুম্বনে সাজিয়ে দেব!
কিন্তু অসময়ের বর্ষাতে,
শরতের মেঘকেও হারিয়ে ফেললাম।
আমি আজ পাগলের মত ভালোবাসি
আমার ভালোবাসার অপরাজিতাকে।
কিন্তু আমি এতদিনে জেনেছি--
আমার অপরাজিতাও অন্যের পায়ে শোভা হবে।
সে হয়তো আমার বুকেই আর থাকবে না।
হায়! জীবনে শুধু দুঃখই পেয়ে গেলাম--
সুখের লক্ষ্যে!!

বর্ষা মানে

— বিজয় নন্দী
(বি.এস.সি.-সাম্মানিক, প্রথম বর্ষ)

বর্ষা মানে টুপুর টাপুর
বৃষ্টির ধারা।
বর্ষা মানে পুকুর-ঘাট-নদী
বৃষ্টির জলে ভরা।
বর্ষা মানে লাঙল নিয়ে
চাষীরা মাঠে গেলে।
বর্ষা মানে ফুটবল নিয়ে
ছেলেরা মাঠে খেলে।
বর্ষা মানে ব্যাঙেরা
গোঁ গোঁ শব্দে ডাকে।
বর্ষা মানে মেঘের ডাকে
চারিদিকে নিস্তব্ধ।
বর্ষা মানে মেঘের ফাঁকে
সূর্যের একটু দেখা।
বর্ষা মানে তোমার দিকে
উদাস চেয়ে থাকা।
বর্ষা মানে আলের ধারে
ঘাসের বেড়ে ওঠা।
বর্ষা মানে তোমায় ঘিরে
কত স্বপ্ন দেখা।

পৃথিবী

—আন্তির্ক দেয়াসী
(দর্শন-সাম্মানিক, প্রথম বর্ষ)

হে মা বসুন্ধরা কত সুন্দর তুমি।
তোমারই কোলে জন্ম নিয়েছি আমি।।
এই পৃথিবীর সবুজ শস্য তোমারই দান।
তবুও তোমাকে কেহ করেনি সম্মান।।
সবাই বলে আমার আমার,
এ জগতে সবকিছুই তোমার।।
ভুলিব না আমি তোমার দান।
এ পৃথিবীর আমরা সবাই তোমারই সন্তান।।
এ পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছিল নেতাজি আর ক্ষুদিরাম।
তাদের প্রতি রইল আমার সহস্র প্রণাম।।
একদিন চলে যাব তোমাকে দিয়ে ফাঁকি।
মাপ করে দিও মাগো যদি কোনো ভুল করে থাকি।।
সুন্দর এই মাতৃভুমি মা গো তোমায় প্রণাম করি
বারে বারে যেন তোমার কোলেই জন্ম নিতে পারি।।

আমার স্বপ্ন

—অপর্ণা সূত্রধর
(বি.এ., প্রথম বর্ষ)

জীবন পথের পথিক আমি
যাচ্ছি অনেক দূরে
জীবনের ঐ শেষ সীমানায়
যাবোই কষ্ট করে।
মনে একরাশি আশা নিয়ে
চলেছি একা একা
জানিনা আমি সেই স্বপ্নের
পাবো কিনা আজ দেখা!
অচেনা এক স্বপ্নপরী
হাতছানি দিয়ে ডাকে
তোরই জন্য দাঁড়িয়ে আছি
বলছে সে আমাকে।
হাত বাড়িয়ে দেখার আশায়
স্বপ্নের সেই দেশ
জানি আমি এই যে পথের
হবে একদিন শেষ
সেদিন আমার সব স্বপ্ন
সত্যি হবে যতো
হে ভগবান! প্রণাম জানাই
তোমায় শতশত।

রমনী

–শ্রী বৈদ্যনাথ দাস
(ভূগোল-সাম্মানিক, তৃতীয় বর্ষ)

চিন্তামগ্ন মন, ভাবছে উদাস হয়ে
হচ্ছেটা কী? শিক্ষা আজ কোথায়?
চারিদিকে হানাহানি, অস্পষ্ট বাণী-
পদদলিত নারী, উচ্ছিষ্টের ন্যায়।
জাতির স্তম্ভ ঐ রমণী--
বিদ্যার আতুরঘর-
উই পোকার শিকার আজি,
হার্বাটের ওই স্বর।
শায়িত হাজার পুষ্প
নতুন রবির আশায়
পারবে কি মেলতে পাপড়ি?
অজ্ঞ নারীর বাসায়।
শিক্ষা দাও, শ্রদ্ধা কর, ঐ মাতৃ কুল।
তারাই জাগাবে চেতনা মোদের, ভাঙবে ঐ ভুল।

* Herbert is a philosopher. He said, "A good mother is worth a hundred school master."

মা আসছে

–প্রিয়াঙ্কা গোস্বামী
(বি.এ., দ্বিতীয় বর্ষ)

শরতের আকাশ মেতে উঠে
পূজোর রঙেতে
মন যে বলছে
পূজো এসে গেছে।
চারিদিকে ভরে গেছে সাদা কাশফুল
তাই আনন্দে মেতে উঠেছে নদীর দু-কুল।
শিউলি ফুলে ভরে গেছে পথের মাঝেতে
মা আসছে যে -- তাই
শিউলি ফুলের উপর হেঁটে হেঁটে।
সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী
মজা জমে উঠবে তখনি।
ঢাকের তালে ভরে উঠে মন
গানের তালে নাচব সারাক্ষণ।
আড্ডাতে আনন্দতে মনটা থাকে টান্‌টান্‌
জমজমাটি মজাতে মনটা থাকে সারাক্ষণ।
এসব ছাড়তে মন চায় না কোনদিন
দশমী আসে যেদিন
মনে দুঃখ আসে সেদিন।
দশমীতে মা যায় তার শ্বশুরবাড়িতে।
সারাটা বছর থাকব সবাই
খুশির মেজাজে।
পূজো আসছে আবার
কবে - সেই অপেক্ষাতে।

Spirit of Love

-- *Papiya Mondal*
(Hist.-Hons., 3rd Year)

I feel your love so naturally
It seems you are the only
Love I have ever had.
And it makes me sad when I
Think of all the times spent
Searching for your love.

স্বপ্ন

— পাপিয়া ঘোষ
(বি.এ., প্রথম বর্ষ)

স্বপ্ন দেখি এলোমেলো-
স্বপ্নগুলো ভাঙা
স্বপ্ন দেখি সাদাকালো-
স্বপ্ন দেখি রাঙা
স্বপ্ন দেখি বড়ো হওয়ার
স্বপ্নে দেখি তুমি
স্বপ্ন দেখি বন জঙ্গল
স্বপ্ন মরুভূমি।
স্বপ্নগুলো কাঁদায় শুধু
স্বপ্ন গুলো হাসে
স্বপ্নগুলো বাঁচতে শেখায়
বাঁধে জীবন পাশে।

মা-মাটি-মানুষ

— শান্তিময় ঘোষ
(সংস্কৃত-সাম্মানিক, প্রথম বর্ষ)

আমার বাংলা সোনার বাংলা
করব রক্ষা আমি
আমার ভারত তোমার ভারত
রাখতে ভালো তুমি–
গাইবে তুমি সাম্যের গান
বাঁচবে মাথা তুলে
ডাকবে তুমি আপন ভেবে
জাত ভেদাভেদ ভুলে
'মা-মাটি-মানুষের জয়'
হোক না তোমার ধর্ম
মা-মাটি-মানুষের তরেই
করোনা যত কর্ম।
বাঁচবে সবাই কটা দিনই
তইতো রাখো চিহ্ন
যা তোমাকে প্রামাণ দেবে
তুমি হয়েছ ধন্য
আসল কথা দুটি তো নয়
একটাই সব শেষ
তুমি কেমন মানুষ হবে
ব্যবহার বেশ।

বর্তমান সভ্যতা

—অভয় দাশগুপ্ত
(প্রাক্তন ছাত্র)

সব জিজ্ঞাসা? কেন এভাবে অকালে ঝড়ে পড়ে?
এই সব অতুলনীয় মেধা
তারা কী বিকাশের কোন জায়গা পাবে না?
অন্ধকার ভবিষ্যৎ - এর এই উজ্জ্বল দিক
এভাবে বারে বারে কেন নিবে যায় আশার প্রদীপ
অজ্ঞানে নষ্ট হয় কত অমূল্য প্রতিভা
এর কারণ কি শুধুই দারিদ্র
নাকি শিক্ষিত সমাজের চেতনাহীন, নিষ্ঠুর বর্বরতা?

জীবন যন্ত্রণা

—তনুজা খাতুন
(ইংরাজী-সাম্মানিক, প্রথমবর্ষ)

দুঃখ যদি জীবন হয় জীবন মানে যন্ত্রণা,
দুঃখটাকে জয় করা -- এটাই হবে মন্ত্রণা।
জীবন যুদ্ধে লড়তে গিয়ে পেতে হয় কত লাঞ্ছনা,
স্বপ্নপূরণ করতে গিয়ে জীবন জুড়ে শুধু বঞ্চনা।
কালিমামুক্ত জীবন পেতে শুনতে হয় গঞ্জনা,
তাও ভোলা যায় যদি পাওয়া যায় একটু খানি সান্ত্বনা।
তাই দুঃখ যদি জীবন হয়, জীবন মানে যন্ত্রণা।
হাসি মুখে দুঃখ ভোলা-- এটা যদিও মন্দ না।
জগৎটাকে খুশি রাখা -- এটাই হোক তোমার বন্দনা।
বাস্তব যে বড়ই কঠিন যেন ভাঙা আয়না,
শত চেষ্টা করেও যেন কালিমা মোছা যায়না।
সময় বড়ো মূল্যবান বাঁধা যে সে রয়না,
ব্যথা বড়ো নিষ্ঠুর হলে সে তো মনে সই না।
জীবনা যে বড়োই ছোটো মাপকাঠিতে ফেলোনা।
চার আনা হাসি জুড়ে তো বাকী জীবন কান্না।
তাই দুঃখ যদি জীবন হয় জীবন মানে যন্ত্রণা।

একদিন বুঝবে তুমি

—নিমাই রুইদাস
(বি.এ., দ্বিতীয় বর্ষ)

আজ নয়, কাল নয়, একদিন বুঝবে তুমি
মাস, বছর ঘুরে কত বৎসর পেরিয়ে যাবে
জানি সেদিন বুঝবে তুমি,
বার বার ছুটে গিয়েছি তোমার কাছে
আমার ভালোবাসার আশা নিয়ে,
কিন্তু তুমি আমার ভালোবাসা
বুঝতে চাওনি।
তুমি এসেছো কাছে, ধরোনি হাত
জল দেখনি চোখের কোণে।
আজ মনের মধ্যে তোমার এত অহংকার
সেই দিন নাও থাকতে পারে।
আর কেও না জানুক, আমি জানি
একদিন বুঝবে তুমি।
সেই দিন তোমার মনে থাকবে না কোন
অভিমান, থাকবে না অহংকার।
হয়তো নীরব চোখের কোণে আসবে
দীর্ঘদিনের পর বোঝার অশ্রু।
পৃথিবীতে সেই দিন আমি
নাও থাকতে পারি।
সেই দিন বুঝবে তুমি
একদিন ঠিক বুঝবে তুমি।

মনের সাধ

—মৌসুমী সিংহ
(বি.এ., তৃতীয় বর্ষ)

নিঝুম রাতের ভরা বর্ষণে,
এক পুরাতন সাধ জেগেছে মনে।
সুরে ছন্দে-বর্ণে গন্ধে
লিখব কবিতা মহানন্দে।
নাই বা হল সুন্দর,
চিন্তা করি মন্থর।
কী যে লিখি পায় না কিছুই খুঁজে--
বারে বারে তোমার সুর মনেতে বাজে।
কিন্তু আমি ভেবেছি আজি,
লিখব নাকো তোমার গুণের রাশি।
সেই সকাল থেকে বসেছি লিখতে-
একটা লাইনও পারিনি মেলাতে--
বুঝেছি, আর হবে না কিছু আমাতে।
তাই, খাতা পেন ভরছি ব্যাগেতে।

আমার প্রেম

— ইন্দ্রজিৎ
(দর্শন-সাম্মানিক, দ্বিতীয় বর্ষ)

আমার প্রেম ছড়িয়ে আছে
নীল আকাশের গায়।
তারায় ভরা আলো শাখা
স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায়।

আমার প্রেম ছড়িয়ে আছে
বসন্তের সন্ধ্যাতে।
মৃদু-মন্দ বাতাসেতে
মহুয়া ফুলের গন্ধেতে।

আমার প্রেম ছড়িয়ে আছে
কুহু কুহু গানে।
মৌমাছি ভোমরার
গুনগুন গুঞ্জরিয়া তানে।

আমার প্রেম ছড়িয়ে আছে
শ্রাবণ ঘন মেঘে।
যেথায় গাছেরা বৃষ্টি মাগে
সারাটা রাত জেগে।

আমার প্রেম ছড়িয়ে আছে
কালো মেঘের পরে',
যেথায় কাল বৈশাখীর ছোঁয়ায়
সিন্দুর আম পড়ে।

আমার প্রেম ছড়িয়ে আছে
মেঠো পথের বাউল গানে
যেথায় বাতাস খেলা করে
মাঠভরা সোনার ধানে।
আমার প্রেম ছড়িয়ে আছে
স্নিগ্ধ বটের তলে।
যেথায় রাখাল বসে বসে
বাঁশিতে সুর তোলে।
আমার প্রেম ছড়িয়ে আছে
লাল-মাটির ধুলায়।
যেথায় সকলগরুর গাড়ী
সার বেঁধে পার হয়।

আমার প্রেম ছড়িয়ে আছে
ফুলের থাকে থাকে।
তোমার থেকে বহুদূরে
পাব আমি তাকে।

আগমণী বার্তা

—শ্রীকান্ত বাউরী
(দর্শন-সাম্মানিক, দ্বিতীয় বর্ষ)

শরৎ এলো, পুজো এলো
এলোপুজোর গন্ধ।
আকাশ বাতাস জগৎ জুড়ে
কেবল মধুর ছন্দ।।

আগমণী গানের সুরে
সকাল কিম্বা সাঁঝ দুপুরে।
উদাসী মন পাগলা হাওয়ায়
যায় যে উড়ে কোন সুদূরে।।

পথ চলতে পথের ধারে
শিউলী ফুলের বাস ছাড়ে।
অজানা কোন নদীর তীরে
কাশ ফুলেরা মাথা নাড়ে।।

পুকুর জুড়ে পদ্ম-শালুক
উঠেছে আজ ভরে।
ঝলমলিয়ে উঠছে হেসে
সোনালি রবির করে।।

সাদা-কালো পালক পরা
মেঘের ফাঁকে ফাঁকে।
সূর্যি মামা এরই মাঝে
মুখ লুকিয়ে থাকে।।

ঝাপসা মেঘে হঠাৎ করে
বৃষ্টি গেল এসে।
খানিক পরে সূর্যি মামা
উঠলো আবার হেসে।।

উঠলো বেজে ঢাকের আওয়াজ
সঙ্গে কাঁসর-ঘন্টা।
পুজো এবার দেখতে যাব
ছটফট করে মনটা।।

দেখতে এলাম মা'কে এবার
নিত্য নতুন সাজে।
কাঁসর ঘন্টা, উলুধ্বনি
সঙ্গে ঢাক বাজে।।

হনুমানের আবিষ্কার

— শান্তনু খাঁড়া
(বি.এ., তৃতীয় বর্ষ, প্রাতঃ বিভাগ)

রামের ভক্ত বীর হনুমান
একটা বিশেষ কাজে
ডিঙিয়ে সাগর লঙ্কা গেলেন
বন্দি সীতার খোঁজে।
তারপরে হয় লঙ্কা কাণ্ড
এতো সবাই জানি।
রাবন রাজার বিশাল বাগানে
রসালো সে ফল দেখে
মন মজে যায় হনুমানের
দু-চারখানা চেখে।
হাজার বিশেক আম তো খেলেন
পেটটি পুরো ভরে
খাবার পরে আমের আঁটি
ফেলেন ছুঁড়ে দূরে।
দূর মানে নয় যেমন তেমন
সাগর হল পার
তার পরেতেই আমাদের দেশে
অবাক আবিষ্কার
হিমসাগরের ল্যাংড়া আমের
ভক্ত সবাই আজ
ক'জন জানে হনুমানের
এই যে অমর কাজ?

শিক্ষা

— মৌমীর বাউরী
(ইংরাজী-সাম্মানিক, প্রথম বর্ষ)

শিক্ষা শিক্ষা শিক্ষা সবার মূলে শিক্ষা
ডেকে বলি সবারে এতে নাও দীক্ষা।
সবই পাবে তুমি কি নাই গুণি
প্রাচীন গল্প থেকে নানা কথা কাহিনী।
প্রেম প্রীতি ভালোবাসা, আছে নিষ্ঠুরতা
সব জানবে তুমি শিখবে মানবতা।
প্রতিবাদী হবে তুমি অন্যায়ের বিরুদ্ধে
সবার আগে আসবে ছুটে অন্যের বিপদে।
শুধু কি চাই -- আরও আছে কথা
হবে হুঁশিয়ারী বাড়বে সচেতনতা।
জানতে সবার আগে এটা ভাল কি মন্দ
বিচার বিশ্লেষণ করবে থাকবে না দ্বন্দ্ব।
জীবন তোমার উঠবে ভরে জ্ঞানের আলোয়
সম্মান দিয়ে বলবে সব্বাই ওগো বাবুমশায়!
তখন তুমি খুশি হয়ে বলতে মনে মনে
ভুল করিনি এ জীবনে লেখাপড়া শিখে।
স্বাক্ষর না, হতে হবে তোমায় শিক্ষিত
পালন করবে সমাজে তোমার যা দায়িত্ব।

কল্পনার অতীত

— মেঘলনা দাশগুপ্তা
(বি.এ., তৃতীয় বর্ষ)

বাস্তবের নিরীখে অবাস্তবের পথে আমার এই কথা
চেতনাহীন মনে অচেতন হয়ে আমার আজ এই লেখা
বিশ্বাস এর আশ্বাসে ভরসা পেয়ে অবিশ্বাসের পথে দাঁড়িয়ে..
তোমার কথায় সম্মত না হয়ে এই বেহাল দশা
বাস্তবের নির্মম আঘাতে বারে বারে দংশিত হয়
এই তরুণ মনের সর্বজয়ী চেতনা
তাকে জাগিয়ে তুলে আজ এই প্রতিবাদী মনোবেদনা
হিংসা ভুলে সবাইকে নিজের ভেবে এই কঠিন দশা।

তোমাদের সাথে কেটেছে অনেকটা সময়
তাই অনেক নির্মম, কঠোর সত্য জেনেও থেকেছি অবিচল
মুখ ফুটে বলতে পারিনি কিছুই তখন
কিন্তু মনে মনে করতে চেয়েছি তার প্রতিবাদ
তার ফলে আজ এ কী অবস্থা;
তোমরা যে যার নিজের পথে কর্মব্যস্ত।
কিন্তু আজ আমি ভীষণ একা
আসলে একা নয়, আমি ভীষণ বোকা।

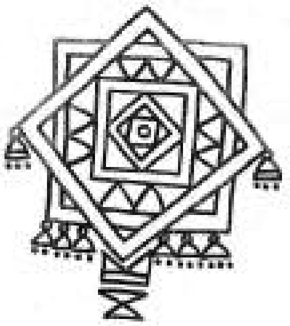

২৫শে ডিসেম্বর

ঘুমের মধ্যে আলোর মেলা-
ভালো থাকার জ্ঞান।
কেমন আছো বন্ধু তুমি
কেন অভিমান।

কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে-
২৫শে ডিসেম্বর;
পালটে দিল তোমার আমার
জীবন নদীর বাঁক।

হইচই আর বিষণ্ণতা-
নীরব সবুজ দুপুর,
আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে
বৃষ্টি টাপুর টুপুর।

আমন্ত্রণ

— হারাধন হেমব্রম
(প্রাক্তঃ বিভাগ)

মায়ের সম্মুখে মেয়ের নিবেদন
মা গো! মোর বিবাহে সাঁওতাল
বন্ধুটিকে করিব কি আমন্ত্রণ?
না, মা না করিও না এমন ভুল
শুনিয়াই কাঁপিতেছে মোর বুক।
এ জাতি নিম্নমানের সাবই করে ঘৃণা
আমি হিন্দু হইয়া, দেব না পূর্ণ করিতে,
তব এই অমানবী বাসনা।
মা! মোর বন্ধুটিরে করিলে অবমাননা।
তবে শোন; যাহা কাহিনী রহিয়াছে অচেনা।
যবে ছিনু আমি ছাত্রী নিবাসে
শিক্ষীকার আঁখি ফাঁকি দিয়া গে'ছিনু
সকল বান্ধবী মিলিয়া মেলা দেখিতে।
ফিরিবার পথে সন্ধ্যা ঘনিয়া আসে
সহসা, মোর দেহ বিষময়ী হ'তে থাকে সর্পাঘাতে।
কি করিবো নাহি পাই কোনো 'জ'
এদিক, ওদিক করিতেছে সহপাঠীগণ
অবশেষে দেখিলা আসিতেছে বাইকে একজন।
তাহাকে শুনাইলাম মোদের অনুশোচনা,
ঈশ্বর স্বরূপ রাখিল সে মম প্রার্থনা।
তারপর নিয়া আসিল চিকিৎসালয়ে,
ডাক্তার দেখিয়া কহে, 'এক্ষুনি রক্তের প্রয়োজন।
যে রক্ত চাহে তব, তাহা হইয়াছে শেষ।
কাল বিলম্ব না করিয়া কর রক্তের ব্যবস্থা।
মাঃ কাহারও রক্ত না মিলাইলেও
মিলিয়াছিল এই অনাথ বন্ধুটির রক্ত।
গিয়াছি তাহার গৃহ, করিয়াছি জলপান
খাইয়াছি আহার, পাইয়াছি বিপুল স্নেহ।
নাহি শুনি ধর্মের কথা, নাহি শুনি জাতির কলরব।
শুনি শুধু ভালোবাসার কথা, মানুষের কথা।
কেবল পারিনাই তোমারে বলিতে।
এত কিছু শুনিবার পরেও দিলে না
যখন অনুমতি; তাহলে বেশ!
যে হইতেছে মোর পতি
তাহার নিকট করিব ইহার উদ্ঘাটন।
যদি পাই সঠিক জবাব, তা হইলেই বিবাহ।
নইলে ভাবিয়া নিও আমি মৃত।

"পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি হল মনুষ্য জাতি।"
— স্বামী বিবেকানন্দ

আমরা সবুজ

— অনুষ্টুপ কারক
(বি.এ., প্রথম বর্ষ)

কেন হত্যা করছো মোদের,
বাঁচার অধিকার কী শুধু তোমাদের?
তোমাদের থেকেও আমরা প্রাচীন--
তাই, পারবে না করতে আমাদের বিলীন।
একে অপরের ওপর নির্ভরশীল আমরা
কেন বারবার সে কথা ভুলে যাও তোমরা?
কৃতজ্ঞতা বোধ নেই আমাদের জানি,
এ জন্যই কী তোমাদের শ্রেষ্ঠজীব বলে মানি?
শ্রেষ্ঠত্ব ক্ষুণ্ণ করে কেন মোদের ওপর নির্যাতন করো,
নিষ্ঠুরের মতো কেন আমাদের হত্যা করো?
নিত্যনতুন আইন প্রনয়ন করছো তোমরা,
আবার সেই আইন ভাঙছোও তো নিজেরা।
নতুন নতুন শ্লোগানে ভরিয়ে তোলা মিছিল--
সে সব যে কি কাজে লাগে, তা বোঝা মুশকিল।
মুখে বলো - 'পৃথিবীকে সবুজ করতে হবে ভাই',
কিন্তু, সবুজ উদ্ভিদকে কেটে কী সবুজ করা যায়?
তাই সব ছেড়ে তোমরা এগিয়ে এসো--
মিছিল-শ্লোগান নয়, শুধু মোদের ভালোবাসা।
তাহলেই দেখবে পৃথিবী সবুজ হয়ে উঠবে--
আর তোমাদের অস্তিত্বের ভিতও মজবুত হয়ে যাবে।
বিপদ ডেকে এলোনা, পৃথিবী থেকে সবুজকে সরিয়ে--
তাহলে তোমরাও যাবে পৃথিবী থেকে হারিয়ে।

স্বপ্নের রঙ

— অর্চনা গরাই
(বি.এ., তৃতীয় বর্ষ)

স্বপ্নের রঙ? সে কি
সাদা না কালো?
নাকি নীল রঙ এ পুড়ানো,
চারিদিকে ছড়িয়েছে
তার আলো.........
স্বপ্নের আকার? সে কি
সাকার না নিরাকার?
বাস্তবে নেই অস্তিত্ব তার,
কি তার বিপত্তি, কি বা তার
পরিসর?
যার ভাবনা চিন্তা কেবলই
অপসর...............
কখনই বা তার আগমন?
শুধুই কি রাত্রে?
শুনেছি মাঝে মাঝে দেখা দেয়
সুদুর নীল আকাশে বা সবুজ
ঘেরা বনের প্রান্তে....
স্বপ্ন, সে কি ধরা
ছোঁয়ার বাইরে?
তবু কেন ডেকে হাতছনি
দেয়
আমায় আপন করে নিবি আইরে.....
স্বপ্ন, শুধু কি নীল?
যার সীমাহীন দীগন্ত রেখাই
হাতড়ে বেড়াই আমার অনাবিল.....

ঠিকানা

— রণিত দত্ত
(দর্শন-সাম্মানিক, তৃতীয় বর্ষ)

পিতামাতাকে ছেড়ে আমি
থাকি এখন যেখানে,
সোনামুখী নামটি তার
সুনাম অনেক সেখানে।
সোনামুখী অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গের
বাঁকুড়া জেলায়,
সবসময় মেতে থাকে,
শিক্ষা, সংস্কৃতি ও নানা খেলায়।
থাকি আমি যেই মেসে
নাম তার 'দত্ত' মেস,
বাড়ি আমার বাঁকুড়া জেলার
ইন্দাস থানাতে।
বাঁকুড়া জেলার শেষ প্রায়
বর্ধমানের নিকটে।
পড়ি আমি সোনামুখী কলেজে
দর্শন অনার্স নিয়ে।
কাজ আর যুক্ত তর্ক বিচার করা
সকলকে দিয়ে।

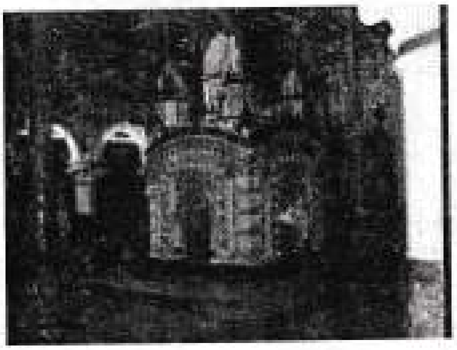

মনের কথা

— অতনু গরাই
(বি.এ., প্রথম বর্ষ)

rossed my path
or them all
specia; blessing
hip answered my call

side every step
fled
e you are here
r's ahead

আমি হলাম শুধুই আমি

— সৌমাভ কারক
(প্রাক্তন ছাত্র)

যখন মনে হয় পাখি হব--
তখন হাতছানি দেয় নীল আকাশ।
যখন মনে হয় পাতা হব--
তখন চোখ ছুঁয়ে যায় ঠাণ্ডা বাতাস।
যখন মনে হয় সাগর হব--
তখন হাতছানি দেয় মেঘরাশি।
যখন মনে হয় দ্বীপ হব--
তখন শরীর ছুঁয়ে যায় জলরাশি।
এই ভাবনাগুলো সত্যি হয়না,
তাই আমি আর কিছু হতে পারিনা।
তাই আমি হলাম শুধুই আমি--
জানি, বুঝতে পারবে না তুমি।

কম্পাউণ্ডার

— বিশ্বজিৎ ওঝা
(ইংরাজী-সাম্মানিক, প্রথম বর্ষ)

কেন হত্যা করছো মোদের,
বাঁচার অধিকার কী শুধু তোমাদের?
তোমাদের থেকেও আমরা প্রাচীন--
তাই, পারবে না করতে আমাদের বিলীন।
একে অপরের ওপর নির্ভরশীল আমরা
কেন বারবার সে কথা ভুলে যাও তোমরা?
কৃতজ্ঞতা বোধ নেই আমাদের জানি,
এ জন্যই কী তোমাদের শ্রেষ্ঠজীব বলে মানি?
শ্রেষ্ঠত্ব ক্ষুণ্ন করে কেন মোদের ওপর নির্যাতন ক
নিষ্ঠুরের রক্ত [illegible] সাইপন
নাকের ঘায়ের নিউসপ্রিন
ঘা শুকোনোর অ্যালগ্রোসিন
আমাশয়ের নেবেন নরফ্লক্স
অ্যান্টি বায়োটিক মানেই এম্পিলক্স
দুর্বলকে বিকসুল দিন
আগুনে পুড়লে বারনল দিন
মাথা ঘোরালে বেশি করে জল খান
আমার ফিসটা দিয়ে যান।

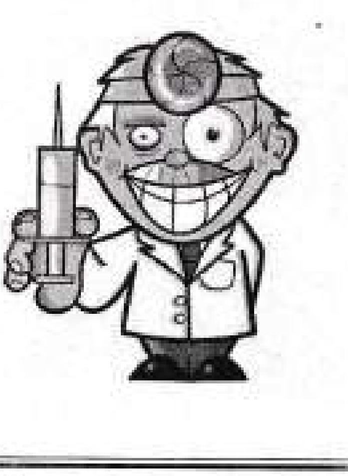

তোমার জন্য

— কৌশিক পাঁজা
(বি.এ., প্রথম বর্ষ)

আমি যখন মেঘের ভেলায়
তুমি কি তখন বন্ধ ঘরে?
আকাশ বলে তোমার জন্যই
মনটা আমার কেমন করে।
আমি যখন গ্রামের পথে
বাঁধন হারা নদীর কাছে,
ফুল বলে, রোজ ইচ্ছা করে
তোমার জন্য ফুটতে গাছে।
আমি যখন হাওয়ার সাথে
পাখনা মেলে ইচ্ছে পাখি,
রামধনু আজ তোমার হাতে
পরিয়ে দেবে ফুলের রাখী।
আমি যখন অনেক দূরে
সেই যেখানে পাহাড় চূড়ো,
তোমার জন্যই ডানপিটে রোদ
কুড়িয়ে রাখে খুশির গুঁড়ো।
আমি যখন শিশির হয়ে
শারদ শেষে ধানের শিষে
তখন দেখি আলাদা নই
তোর সাথে তো আছি মিশে।

Best Friend

-- *Sandip Gorai*
(Ex-Student)

Many friends have crossed my path
And I thank God for them all
But I got an extra specia; blessing
When your friendship answered my call

You stayed by my side every step
Even when others fled
I know that because you are here
I can face whatever's ahead

Your smile and laugh urge me on
And encourage me to be strong
Your loving support helps me stand
When the road is rough and long

So much that I can thank God for
My family and health
But when he blessed me with you
He gave me than wealth

Mortal words could never explain
What you have come to be
You are my life, my world, my heart
You are my BEST FRIEND, made for me.

প্রত্যাশা

— মহম্মদ সফীউল্লা হক মল্লিক
(ইউনিভার্সাল ছাত্র)

আমার চিন্তাগুলো কল্পনার জালে পাক খেয়ে ঘুরে
পথ পায় না, দারুণ দাবানলে দগ্ধ হয়ে ফিরে
মৃদু বাতাসে কাঁপে হৃদয়ে, রঙ মুছে যায় মরিচার
কালো আঁধারে। ভাবি, শুধু একদিন হবে কল্পনার
অপরূপ বিকাশ আমার এই সবুজ দ্বীপের ভিতর
মাথা উঁচু প্রবাল স্তূপ।
জীবনে কখনো নির্জন হাজার মানুষের ভিড়ে -- হারিয়ে যায়
নিজের নিঃসঙ্গতা সর্বদা ছায়া হয়ে মনে ফিরে।
চলার পথে মোরা সাথী-সঙ্গী অনেক পাই--
জীবন চলার শেষে হায় কেহ যোটে নাই।
আমার জীবনে না জানি এ কোন ক্ষয়!
হায় কল্পনা দেবীর বালি ঘর।
চলে যায় জীবনের অতি ক্ষীণ দিন গুলি,
ভরসা নাই ছিন্ন মূলে বৃক্ষ রোপনে--
এক দিন শেষ হয়ে যাবে তাই
দুটি স্বপ্ন-মাখা ধূসর চোখ। পারবে কি স্বপ্ন পূরণের
সঙ্গ দিতে, যদি না পারো অব্যক্ত জমা
যত কষ্টই হোক না কেন নিরাশার দুশ্চিন্তায়
রইব নীরবে। ও গো প্রিয় দাঁড়িয়ে দেখো--
সেদিন আর আশা নিয়ে চাইব না।

"ভগবান যে গুণ, যে প্রতিভা, যে বিদ্যা ও যে উচ্চ শিক্ষা দিয়েছেন, সবই ভগবানের। আমি যদি সবই নিজের জন্য, নিজের সুখ বিলাসের জন্য ব্যয় করি তা হইলে আমি চোর।

— ঋষি অরবিন্দ

ভালোবাসার কিছু চাওয়া

— বাপ্পা মাজি
(বি.এ., তৃতীয় বর্ষ)

জানি না কোন ইশারায় সে কথা বলে
হয়তো সে আমাকে ডেকে চলে
মনের অজান্তে খুবই একান্তে খুঁজে চলি যাবো,
ভালোবাসার ঠিকানায় পাবো আমি তাকে,
নিঃস্তব্ধ রাতের অবসানে ভোরের পাখি জানে
ভালোবাসার নৌকাতে পাঠালাম আমার মন
রামধনুরঙে সাজাবো বেরঙ্গে জীবন
সত্যি বলছি হৃদয় জুড়ে রয়েছো কেবল তুমি
সব উপহারের মাঝে তুমি শুধু দামি
কাজল চোখের পলক আর একটু লাজুক হাসি
বলছে আমার পাগল মন, তোমায় ভালোবাসি
হৃদয়ের ক্যানভাসে ছবি এঁকেছি আমি তোমার
দিয়ো একটু জায়গা তোমার মনের মাঝে
এই তো শুধু চাওয়া।

আবছা অবকাশ

— তানিয়া দাস
(সংস্কৃত, দ্বিতীয় বর্ষ)

বলতে না পারা অনেক অনেক কথা
মিশে আছে শেষ বিকেলের গায়ে
শেষ বসন্তের স্মৃতি
একপা একপা করে
বিস্মৃতির দিকে পা বাড়াতে চায়
ঝরে পড়া ফুলের গন্ধ
অনুভূতির রং
জড়িয়ে ধরে আমায়
অব্যক্ত শব্দ ঠিক
যেন আমার পাশে এসেছে
এক দুষ্টু বাতাস কানে বলে
যা কিছু বলার ছিল, এই তো সময়
বলে দে, এরপর হয়তো সময় চলে যাবে
ঘোলাটে আবছা আকাশ
নীরব হয়ে থাকে।

চিরদিনের

— চিত্রা মণ্ডল
(বি.এ., প্রথম বর্ষ)

এখানে বৃষ্টিমুখর লাজুক গাঁয়ে
এসে থেমে গেছে ব্যস্ত ঘড়ির কাঁটা,
সবুজ মাঠেরা পথ দেয় পায়ে পায়ে
পথ নেই, তবু এখানে যে পথ হাঁটা।
জোড়া দিঘি, তার পাড়েতে তালের
সারি
দুরে বাঁশঝাড়ে আত্মদানের সাড়া,
পচা জল আর মশায় অহংকারী
নীরব এখানে অমর কিষণ পাড়া।
এ গ্রামের পাশে মজা নদী বারো মাস
বর্ষায় আজ বিদ্রোহ বুঝি করে,
গোয়ালে পাঠায় ইশারা সবুজ ঘাস
এ গ্রাম নতুন সবুজ ঘাঘড়া পরে।
রাত্রি এখানে স্বাগত সান্ধ্য শাঁখে
বিষাণকে ঘরে পাঠায় যে আল-পথ;
বুড়ো বটতলা পরস্পরকে ডাকে
সন্ধ্যা সেখান জড়ো করে জনমত।

দুর্ভিক্ষের আঁচল জড়ানো গায়ে
এ গ্রামের লোক আজো সব কাজ করে,
কৃষক বধুরা ঢেঁকিকে নাচায় পায়ে
প্রতি সন্ধ্যায় দীপ জ্বলে ঘরে ঘরে।
রাত্রি হলেও দাওয়াল অন্ধকারে
ঠাকুমা গল্প শোনায় যে নাতনিকে,
কেমন করে সে আকালেতে গতবারে
চলে গেল লোক দিশাহারা দিকে।
এখানে সকাল ঘোষিত পাখির গানে
কামার, কুমোর, তাঁতি তার কাজে জোটে,
সারাটা দুপুর ক্ষেতের চাষির কানে
একটানা এর বিচিত্র ধ্বনি ওঠে।
হঠাৎ সেদিন জল আনবার পথে
কৃষক-বধূ থমকে তাকায় পাশে,
ঘোমটা তুলে সে দেখে নেয় কোনোমতে
সবুজ ফসলে সুবর্ণ যুগ আসে।

স্বাধীনতার পরে নারী আজও পরাধীন

— পৃথা গাঙ্গুলী
(ইংরাজী সাম্মানিক, দ্বিতীয় বর্ষ)

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট আমরা হলাম স্বাধীন। এরে আগে প্রায় দু'শো বছর আমরা ইংরেজদের পরাধীন ছিলাম। আমাদের এই স্বাধীনতাকে অর্জন করার জন্য কত মানুষের প্রাণ গিয়েছে, কত মানুষ অনায়েসে তাদের জীবন এই স্বাধীনতার পায়ে অঞ্জলি দিয়েছে। কত মানুষ ইংরেজদের অত্যাচারে নিরবে নিভৃতে হারিয়ে গেছে অন্ধকারে। এই স্বাধীনতা আন্দোলনের মাত্র ক' জনকেই বা আমরা জানি! আমাদের জানার বাইরে অনেক মানুষ আছে যারা স্বাধীনতা লাভ করার জন্য নিরবে নিজেদের সমস্ত কিছু দান করেছে কিন্তু কেউ তাদের একটা বর্ণও জানতে পারে নি। এত কিছুর পর আমরা স্বাধীনতা পেলাম ঠিকই কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা লাভের ৬৬ বছর পরেও আমরা; মেয়েরা কি আদৌ স্বাধীন? আমাদের দেশ ভারতবর্ষ হয়ত স্বাধীনতা পেয়েছে কিন্তু এদেশের মেয়েরা তো এখনোও স্বাধীনতা পায় নি। তারা এখনও পরাধীন। জানি এই ৬৬ বছরে আমাদের দেশের অনেক উন্নতি হয়েছে। আমাদের দেশের মানুষ ইংরেজদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছে। আজ আমাদের দেশের মানুষ উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে গেছে কিন্তু মানুষের এত উন্নতি হলেও এখানকার মানুষ কোনোদিনও শেখেনি যে মেয়েদের কিভাবে সম্মান করতে হয়। এদেশের পুরুষেরা অবশ্য শুধু পুরুষেরা কেন একজন মেয়েও অন্য একটা মেয়েকে অকথ্য অত্যাচার করে। আর যে সব মেয়েরা মেয়ে হয়েও অন্য একটা মেয়েকে অপমান, অত্যাচার করে তখন সেই মেয়েটা বোধহয় ভুলে যায় যে, 'আমিও একজন নারী' আর পুরুষদের তো কথায় নেই! তারা তো ভুলেই যায় যে একজন নারীর থেকেই তাদের সৃষ্টি, তাদের মায়েরাও একজন নারী। মেয়েরা জন্মের পর থেকে বিয়ের আগে পর্যন্ত তাদের বাবা-মা এর পরাধীন; আর বিয়ের পর তাদের স্বামীর; আর বৃদ্ধ বয়সে তাদের ছেলে বা মেয়ের। সবার ক্ষেত্রে একই ঘটনা ঘটে। একজন নারী এখনই তার জীবনটা নিজের ইচ্ছায় কাটাতে পারে না। কারণ, আমাদের এই সমাজে একটা মেয়ে যদি তার জীবনটা নিজের মত করে কাটাতে চায় তখন সমাজ তাকে 'নষ্ট মেয়ে' বলে আখ্যা দেয়। শুধু পুরুষেরা নারীদের পরাধীন করে রাখে তা নয়, মেয়েরা নিজেরাও স্বাধীনতা চায় না। তারা চায় সারাটা জীবন অন্যের দয়ায় অন্যের হয়ে বেঁচে থাকতে। আসলে জীবনে মুক্তির স্বাদ যারা পায়নি তারা মুক্তি চায় না, আসলে তারাতো জানেই না যে 'মুক্তি কাকে বলে'?

আর মেয়েরা তো শুধু পরাধীন নয় তারা এখন পণপ্রথার স্বীকার। একটা মেয়ে যত শিক্ষিতই হোক না কেন বিয়ের সময় ছেলের বাড়ি থেকে একটা বড় মাপের টাকা পণ নিয়ে তবে সেই মেয়েটাকে তারা বাড়ির বউ মা করে নিয়ে যায়। আর যে সব ছেলেরা বিয়েতে মেয়ের বাড়ি থেকে পণ নেয় তারা কি একটুকুও বোঝে না যে তারা মেয়ের বাড়ির কেনা গোলাম হয়ে যাচ্ছে। আসলে ছেলেরা মনে হয় নিজেদেরকে বিক্রি করতে চায় তাই বিয়ের সময় মেয়ের বাড়ির থেকে ভালোভাবে দরাদরি করে নিজেদের বিক্রি মূল্য ঠিক করে নেয়।

আসলে ছেলেরা বুঝতেও পারেনা যে, বিয়ের পণের নাম করে তারা বাজারের আলু-পটলের মত বিক্রি হয়ে যাচ্ছে মেয়েদের কাছে। একে তো এত বেশি টাকা নিয়ে একটা মেয়েকে বিয়ে করে তারপর আবার পণের টাকা দিতে না পারলে মেয়েটাকে অত্যাচার করে। আর একটা মেয়ে যখন অন্তঃসত্তা হয় তখন তাকে প্রথম দিন থেকে শ্বশুর বাড়ির কাছ থেকে শুনতে হয় যে, 'বউমা আমাদের গোপাল চায়' আরে একটা ছেলেই কি একটা সংসারের সবকিছু? আর মেয়েরা? তারা কি শুধুই ফেলনা। একটা সংসার চালাতে গেলে লক্ষ্মীর প্রয়োজন হয় সেটা বোধহয় এই সমাজ জানে না। তাই নির্বিচারে তারা কন্যাভ্রূণ হত্যা করে চলেছে। একটা নিষ্পাপ প্রাণকে হত্যা করার মতো পাপ কাজ এই সমাজ নিষ্কম্পিত চিত্তে করে চলেছে।

মেয়েরা যে প্রকৃতির একটা অঙ্গ, মেয়েরা যে একটা বিরাট শক্তি সেটা এই সমাজ যেন মেনেও মানতে চায় না। এই সমাজ চায় না যে মেয়েরা স্বাধীন হোক। এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ভুলে গেছে যে; যে প্রকৃতির বুকে তাদের জন্ম সেও একজন নারী; সব শক্তির উৎস যে এই নারী শক্তি তারা সত্যিই ভুলে গেছে। তার এখনকার নারী স্বাধীনতা আন্দোলন? সেগুলির তো মুখেই বড় বড় কথা কাজের বেলা কিছুই নেই; নামেই নারী দিবস পালন করে এই সমাজ। শুধু বছরে ঐ একটা দিনই নারী স্বাধীনতার জন্য সবাই চিৎকার করে। বাকি সারা বছরটা সবাই চুপ। তবে এভাবে আর চুপ করে থাকলে চলবে না। এই দেশের সমস্ত নারীকে একসাথে হয়ে আন্দোলনে নামতে হবে। এমন একটা শক্তি গড়ে তুলতে হবে যাতে এই পুরুষ তান্ত্রিক সমাজ ঐ নারী শক্তি দেখে ভয় পায়। তারা যেন নারীর উপযুক্ত সম্মান দিতে পারে।

"যাকে আশা করি তাকে যতখানি পাই, আশা পূর্ণ হলে তাকে আর ততখানি পাই না। অর্থাৎ চাইলে যতখানি পাই পেলে ততখানি পাই না।"

-- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

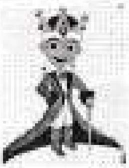

রাজা নামেই রাজা

—অচিন্ত্য মাল
(বি.এ. বাংলা সাম্মানিক, দ্বিতীয় বর্ষ)

আজও সে সেজেছে এক রাজ্যের রাজা। রাজ্যের নাম রূপনগর। আর এই রূপনগরের রাজা হলেন রূপকুমার। রাজা হিসাবে সে খুবই সুদক্ষ, প্রজাবৎসল, মিত্রভাবাপন্ন এক যোগ্য রাজার মত রাজা। রাজ্যে প্রজাদের কোন কিছুরই অভাব নেই। আর রাজাও রাজাকে সুখ-শান্তি সম্পন্ন দেখে খুবই খুশী। বেশ সুখেই কেটে যাচ্ছিল তার জীবন।

কিন্তু হঠাৎ একদিন রাজার রাজ্য জয়ের আশা জেগে উঠল। রাজার একটা বড় দোষ বা স্বভাব হিসাবে বলা যেতে পারে যে, রাজা যখন যা করবে মনস্থির করে, সেটা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কারোর নিশ্চিন্তি নেই। তাই রাজ্যের সকলেই একটু ভাবনায় পড়ে গেল। এর কারণ, বহুদিন ধরে রাজার এই রূপ কোন চিন্তা মাথায় আসেনি। দেশে যুদ্ধও হয়নি বহুকাল। এতদিন তারা বেশ শান্তিতেই বসবাস করছিল। তাই চারিদিকে 'সাজ' 'সাজ' রব পড়ে গেল। অস্ত্র-শস্ত্র তৈরি হতে লাগল, পুরানো অস্ত্রে শান দেওয়া শুরু হল। হাতি, ঘোড়া প্রভৃতিদেরও তৈরি করা হতে লাগল। চারিদিকে গুপ্তচর পাঠানো হল। একদিন সেই চরম ক্ষণ এসে হাজির হল। রাজা গেলেন রাজ্য জয় করতে। শতশত পদাতিক সৈন্য, হাজার হাজার ঘোড়ার চড় সৈন্য, সব চলতে লাগল মাঠের পর মাঠ, বনের পর বন পারি হয়ে। বেশ কয়েকদিন ধরেই চলল এই যুদ্ধ। রাজার মনো বাসনা পূর্ণ হল। রাজা জয় করল সেই রাজ্যটি। তারপর আবার ফিরে এল নিজের রাজ্যে। রাজার রাজ্য জয়ের সংবাদ পেয়ে রাজা প্রাসাদ তখন আবার নতুন করে সেজে উঠল। রাজাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য সকলে রাশি রাশি ফুল নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল রাজার উদ্দেশ্যে। প্রজাদের এত আনন্দ এবং নিজের কর্মদক্ষতায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিলেন রাজা। এই উপলক্ষ্যে রাজ্যে উৎসব শুরু হল। সমস্ত রাজ্যে যেন পৃথিবীর সমস্ত সুখ-শান্তি, আনন্দ এসে পড়েছে। চারিদিকে কত কী তৈরি করা হতে লাগল। নাচ, গান, ইত্যাদিও বাদ পড়েনি। উৎসবে প্রচুর মানুষের আনাগোনা, হাসির কলরব রাজ্যকে মুখরিত করে তুলল.........

হঠাৎ চেঁচামেচির শব্দে রাজার ঘুম ভেঙে গেল। আসলে এই রাজা তো সেই রূপনগরের রূপকুমার নয়, সে হল রামনগর গ্রামের শ্রীকান্ত মাঝির যাত্রার দলের রাজা। যাত্রায় সে সব সময় রাজার অভিনয় করে বলে গাঁ শুদ্ধ লোক তাকে ঐ নামেই ডাকে।

ছোট ছেলের চেঁচা মেচিতে রাজার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু তা হলেও সে যেন রাজা এই ভাব তাকে ছেড়ে যায়নি সেই মুহূর্তেও সে তখনও বিছানায় বসেই রয়েছে কোন এক দিকে চেয়ে। এই দেখে তো তার বাড়ির লোক গেল ক্ষেপে রাজা কী পাগল হল নাকি।

তাই বা কে জানে। রাজার দিদি রাজাকে চুলের মুঠি ধরে বাইরে নিয়ে এল। ব্যাপার না বুঝে রাজা গেল চটে। যেন তার সম্বিত ফিরে এল। তার দিদি তো কেঁদেই আকুল। ঘরে এতটুকু খাবার নেই। সকালে তারা খাবে কী? এই কথাগুলো শুনে তো রাজার মাথায় যেন বাজ পড়ে গেল। তারা দিন আনে দিন খায়। আগের দিন যা একটু রোজগার করেছিল তাতে তো রাতটা কোন রকমে চলে গেছে। কিন্তু আজ! এর মধ্যে কয়েকজনের কাছে প্রচুর টাকা ঋণ হয়ে রয়েছে। আর সময়টাও তো ভালো যাচ্ছে না। বর্ষাকাল সব সময় বৃষ্টি পড়েছে। চারিদিকে জল আর জল। কে-ই বা দেখবে যাত্রা। দারিদ্র তাদের নিত্য সঙ্গী। থেকে থেকে গা সওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু এভাবে চলবেই বা কী করে, আর কতদিন। হায়রে রাজা। মুকুটহীন রাজা!!

ভালো বাসা

— ঋতমা দাশগুপ্ত
(তৃতীয় বর্ষ)

একদিন একটা অজানা নম্বর থেকে ফোন এসেই প্রথম বন্ধুত্বটা হয়েছিল। ঐন্দ্রিলা চায়নি সেটা ভালোবাসা পর্যন্ত যাক। অর্ণব কিন্তু প্রথম দিন ফোন করেই ঐন্দ্রিলার গলা শুনে একটা অন্তঃঅনুভূতির মধ্যে পড়েছিল। তারপর থেকেই শুরু হয় কথা বলা কেন যে ঐন্দ্রিলা কথা বলেছিল অর্ণব-এর সাথে, তা সে নিজেও জানতো না। ঐন্দ্রিলার এক বান্ধবী এই কথা শুনে তাকে প্রশ্ন করে সে অর্ণব কে ভালোবাসে কিনা? সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় অর্ণবকে প্রশ্ন করে ফোনে, 'আচ্ছা তুমি কি আমাকে ভালোবাসো' অর্ণব তার উত্তরে বলেছিল 'তোমার মাথায় কী আছে এটাও বোঝ না, আমি তোমার মাথা ফাটিয়ে দেখব", তখন হয়তো অর্ণব ঐন্দ্রিলাকে ভালো বেসেছিল। কিন্তু কোথা থেকে কী যে হলো। তা তারপর কিছুই বোঝা গেল না।

ঐন্দ্রিলাও অর্ণবকে না দেখে কোন মায়ার টানে যে তার সাথে দেখা করেছিল তা সেও নিজে জানত না। প্রথম দিন অর্ণবকে সে লজ্জায় ভালোভাবে দেখতে পারেনি। কিন্তু এক পলকে ঐন্দ্রিলা অর্ণব-এর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছিল অর্ণব -এর চোখে এক গভীর জিজ্ঞাসা। তারপর অর্ণব-এর কী মনে হয় তার এক বন্ধু অভিষেককে দিয়ে ঐন্দ্রিলাকে ফোন করিয়ে তার ভালোবাসা সত্যি জানতে চায়। ঐন্দ্রিলা অর্ণবকে জানালেও পরে গোপন করে। কারন ঐন্দ্রিলা অর্ণব-এর চোখের সেই করুন জিজ্ঞাসা দেখে খুব ভালোবেসে ফেলে। ঐন্দ্রিলা যেহেতু কোনদিনই নিঃস্বার্থ কোন বন্ধু পায়নি তার জীবনে, তাই সে প্রথমে অর্ণবকে ঠিকঠাক মতো বিশ্বাস করতে পারে না। ঐন্দ্রিলার মনে ভয় হয়; যদি অর্ণব তাকে ভুল বুঝে তার কাছ থেকে চলে যায়। ঐন্দ্রিলা যা ভাবছিল একদিন ঠিক হলোও তাই। অর্ণব ঐন্দ্রিলাকে ফোন করা বা করা সব বন্ধ করে দিল। ঐন্দ্রিলা ভেবেছিল অর্ণব হয়তো কাজের মধ্যে আছে তাই। কিন্তু সেই অভিষেকের ব্যাপারটা তাদের ভালোবাসাকে নষ্ট করে দেয়। এই ছোট একটা ভুল ঐন্দ্রিলা যা অর্ণবকে বোঝাতে পারেনি। অর্ণব এটাকেই তার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল মনে করে চলে যায়।

কিন্তু হয়তো ঐন্দ্রিলার গভীর ভালোবাসার ফলেই আবার তাদের ঘটনাক্রমে দেখা হয়। তখন ঐন্দ্রিলা অর্ণবকে জিজ্ঞাসা করে আচ্ছা তুমি কি আমাকে ভালোবাসো। অর্ণব সেই মুহূর্তে আর কিছু করতে না বলতে পারেনি। তারপর অর্ণব আগে যা ঘটনা ঘটেছে তা ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করে।

আজ ঐন্দ্রিলার শরীর খুব অসুস্থ। হয়তো আজকের রাতটাই তার জীবনের শেষ রাত? আর কোনদিনই সে এমন সুন্দর রাত পাবে না। আজ তার পৃথিবীটা খুব সুন্দর বলে মনে হয় এবং মনে হয় অর্ণব তাকে ভুলে নিয়ে ভালোই ভালোই করেছে। এদিকে অর্ণব আজ নিত চার বছর পর বিছানায় শুয়ে হঠাৎ এক বেদনা তার মোচড় দিয়ে মনে করিয়ে দেয় ঐন্দ্রিলার কথা। অর্ণব ফোন হাতে ঐন্দ্রিলার ছবির দিকে তাকিয়ে থাকে ঐন্দ্রিলার কথা ঐন্দ্রিলা শেষ মুহূর্তে এসে অর্ণবকে ফোন না করে থাকতে পারে না। সে অর্ণবকে

ভোরের দিকে ফোন করে বলে 'আচ্ছা অর্ণব বল তুমি আমাকে কোন দিনই ভালোবাসোনি? শুধু সময় কাটাবার জন্য ফোন করতে। জানতো তুমি ভালো করেছিলে আমাকে ভালো না বেসে, কারণ আমাকে ভালোবাসলে তুমি ভুল করতে। কারণ আমি আর বাঁচব না। আজ সত্যিই বলছি আমি আর বাঁচব না'। অর্ণব জিজ্ঞাসা করে কেন তুমি কোথায়? ঐন্দ্রিলা বিষন্নভাবে জানায় মৃত্যুশয্যায়। অর্ণব ভাবে ঐন্দ্রিলা মজা করছে। কিন্তু একটু কথা বলার পরই অর্ণব বুঝতে পারে সত্যিই ঐন্দ্রিলার কথা কেমন যেন অস্পষ্ট লাগছে আর জড়িয়ে যাচ্ছে। পরদিন সকালেই অর্ণব ঐন্দ্রিলার সাথে দেখা করার নার্সিংহোমে এসে দেখে ঐন্দ্রিলাকে ঘিরে আছে ঐন্দ্রিলার বাড়ির সবাই। অর্ণব ঐন্দ্রিলার হাত ধরে বলতে চায় দেখ আমি এসেছি কিন্তু ঐন্দ্রিলার হাত ধরার আগেই নীচে পড়ে যায়। আর সাথে সাথে পড়ে ঐন্দ্রিলার চোখের দু-ফোঁটা জল অর্ণব-এর হাতে। অর্ণব ঐন্দ্রিলার মুখের দিকে তাকাতেই দেখে ঐন্দ্রিলার মুখে এক অব্যক্ত হাসি। যেন সেই হাসিই বলে দিচ্ছে তুমি আমাকে ভালোবাস।

এরপর অর্ণব গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে আকাশের চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকে, কোথা এক টুকরো কালো মেঘ এসে আকাশ ঢেকে দেয়। নদীর জল বলে চলে অবিরাম। অর্ণব চারিদিকে দেখে নিয়ে নিজেকে আজ ভীষণ একা লাগে। সে আজ বুঝতে পারে না, ঐন্দ্রিলাকে ভালো না বেসেও ভালোবাসা চিরদিনের মত চলে যাওয়ার যন্ত্রনা। হঠাৎ নদীর একটা ছোট ঢেউ যেন তাকে বলে, তুমি আমায় ভালোবাসো! ভালোবেসেছিলে, ভালোবাসতে পারো।

"ভগবান যে গুণ, যে প্রতিভা, যে বিদ্যা ও যে উচ্চ শিক্ষা দিয়াছেন, সবই ভগবানের। আমি যদি সবই নিজের জন্য, নিজের সুখ বিলাসের জন্য ব্যয় করি তাহা হইলে আমি চোর।"

-ঋষি অরবিন্দ

''জাস্ট রামায়ণ''

– শুভ্রকান্তি দে
(গণিত সাম্মানিক, তৃতীয় বর্ষ)

ইদানিং সীতার মনটা একেবারেই ভালো যাচ্ছে না। জঙ্গলে বিভিন্ন পত্রিকা পড়া আর বিভিন্ন চ্যানেল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সিরিয়াল দেখার তো সুযোগ নেই। তাই ফেসবুক করেই সময় কাটায়। অনেক সময় এটাও হয় না, জঙ্গলের এই অঞ্চলে টাওয়ার পাওয়া মুসকিল।

সীতা শ্যামবর্ণ, স্থূলকায়া, গোলগাল তাই হাইটটাও খুব বেশি নয়। তবে কনভেন্ট এডুকেটেড। পলিটিকাল সায়েন্সে অনার্স। পাশা পাশি কুকিংয়ে ডিপ্লোমা। জনক সম্বন্ধে দেখছিলেনই; কিন্তু দেখতে এসে প্রায় প্রত্যেকেরই অপছন্দ হচ্ছিল। ঠিক তখনই ' যেচে বাঁশ কে নিবি' গোছের হরধনুক চক্র সম্বলিত স্বয়ম্বরের নটক। রামের কুষ্ঠিতে বেশ নাম যশ ছিল। তাছাড়া শর্ত অনুযায়ী হরধনুক ভঙ্গন করেছিলেন রাম। মেয়ের চোখ মুখ দেখে রামের প্রতি অনুরাগ বুঝতে পেরে মেয়ের মাও বলেছিলেন, ''আরে বাবা, ব্যাটা ছেলে ঠিক করে কম্মে যাবে, তাছাড়া বড় বংশ তো বটে।'' মা ও মেয়ের দিকে তাকিয়ে আর আপত্তি করা সাজে না, জনকের। তা মনে নিলেও খানিকটা বাধ্য হয়েই বিয়েটা মেনে নিলেন জনক।

রাম-সীতার বনবাসের কথা শুনে জনক দলবল নিয়ে জঙ্গলে রামের কুঠিরের কাছাকাছি হাজির। সেই দিন সীতা একটা দড়ির খাটিয়ায় বসে পা দুলিয়ে দুলিয়ে ডাঁসা পেয়ারা চিবোচ্ছে। পরনে তুঁত ও কমলা রঙের ছাপা ঘটি হাতা নাইটি। এই ভর দুপুরে ভাতের টাইমে পেয়ারা। অদূরে জাম্বুবান বারমুণ্ডা পরে উনুন জ্বালানোর কাঠ টুকরো করছে। জাস্ট তাকানো যাচ্ছে না। সুগ্রিব নড়বড়ে হাতুড়ি দিয়ে কয়লা ভাঙছে। ঘর লাগোয়া বারান্দায় বসে হনুমান হেরিকেনের কাঁচ মুছছে। নরবর করে খান আটেক হেরিকেন তো বটেই।

জনক উঠোনে এসে দাঁড়াতেই সীতা সিনেমার নায়িকার মতো 'বাবা-' বলে ছুটে এল। জাম্বুবান আলগা বারমুডা সামলাতে সামলাতে প্রনাম করল, হনুমান ও সুগ্রিব তাকে অনুসরণ করল। তখনই কৌশল্যার ফোন এল; তিনি ফোনে বেশ খুশিতেই বলছেন যে, তিনি, সুমিত্রা ও কৈকেয়ী নাকি বিধবা ভাতা পাবেন, আজকেই তা তুলতে যাবেন।

জনক কারোর কোনও আপ্যায়নেই কর্ণপাত করল না, সরাসরি সীতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''রাম কোথায় রে?'' অপ্রস্তুত সীতা উত্তর দিল 'ও তো সাইকেলের লিক্ সারাতে গেছে, এখুনি ফিরবে।'

ঠিক সেই সময় সাইকেলের লিক সারিয়ে রামের প্রত্যাবর্তন এবং সঙ্গে এক ব্যাগ তেঁতুল আর এক ব্যাগ রেশন এনেছে। জনক রামকে তখনই বললেন যে, আমি সীতাকে একেবারের জন্য নিয়ে যাব। এই পরিবেশে আমার মেয়ে থাকতে পারবে না।' পলিটিক্যাল সায়েন্স অনার্স বলে নয়, সংসারের পলিটিক্স যে টোটাল অন্যরকম এটা সীতা জীবন অভিজ্ঞতা থেকে ভালোই বোঝে। জনক গলা তুললেন, 'আমার মেয়েকে কমন বই করে রেখেছ, বাপের জন্মে কেউ কোনও রকম

শুনেছ?' রাম একটু তুতলিয়ে, কুঁতিয়ে আটকিয়ে শুধু এটুকু বলল যে, সীতা তাদের কাছে ভালো নেই। সংসারে তাকে বিশেষ কাজ কম্মও করতে হয় না। ক'দিন ধরে জনকের প্রেশারটা বেশি যাচ্ছে, তাই উঠোন দাপিয়ে গর্জে উঠলেন, 'সব কটা লায়ার।' রাম নাকি ওলিম্পিক কুস্তিতে পদক আনবে, যোগ্যতা পর্বই পেরোতে পারছে না! সবাই একই রকম। সীতাকে নাইটি পরা অবস্থাতেই টানতে টানতে গাড়িতে তুলে বাড়ি দিকে রওনা দিলেন।

সেই থেকেই সীতা মনমরা। বনে জঙ্গলে বেশ একটা অ্যাডভেঞ্চার ছিল। মাঝে মাঝে হনুমান, সুপারম্যানের মতো এপং ওপাং ঝপাং করতো ও হাসি ঠাট্টাও করত। কিন্তু জনক মেয়ের ভাল লাগাটা বুঝলেন না। ওকে অবশ্য দোষ দেওয়া যাবে না, বাবার মন তো। তবে রক্ষে যে, তিনি থানা পুলিশ করেননি। হাজত-জামিন এসব নিয়ে অন্তত সীতার শ্বশুর বাড়ির লোকেদের কিছু ভাবতে হয়নি।

যাইহোক, ঠিক সেই সময়ই বারান্দায় জনকের পায়ের আওয়াজ। সীতার আড়ি পেতে কথা শোনার অভ্যাস, তাই সীতা আড়ি পেতে শুনল, তার পিতা উকিলের সাথে কথা বলছে। তাদের মধ্যে যেন ডিভোর্সের কিছু কথা হচ্ছিল। উকিল তো বলছে - ডিভোর্সে কোনো অসুবিধা হবে না। তখনি এই কথা শুনে সীতার মুখ চুন হয়ে গেল।

এমন সময় বাড়ির ভৃত্ত উঁকি দিয়ে শুধু মুখটুকু ঢুকিয়ে জানাল, 'কর্তাবাবু জামাই এসেছেন।' বৈঠকখানায় বসিয়েছি। ডিভোর্সের প্রস্তাব স্থগিত, জনক দ্রুত পায়ে হমহম করতে করতে বৈঠকখানার দিকে হাঁটতে লাগল, পিছনে সলাজ সীতা।

সীতা এসে দেখল, কাঠের গদিআঁটা সোফায় রাম একটা সিনেমা পত্রিকায় বস্ত্র সংকটে ভোগা এক নায়িকার ছবি খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছে। সোফাটার গদিতে ছারপোকা আছে; কিন্তু পত্রিকার সেই লাস্যময়ী রামের সব জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়ে রেখেছে তার হাসি দিয়ে। সীতার অভিমান হল।

জনকদের দেখে পত্রিকা রেখে রাম পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল শ্বশুরকে, জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছেন মেসোমশাই?' শ্বশুরকে মেসোমশাই! উঃ অসহ্য। জনক অধৈর্য ও অসহিষ্ণু - 'তা কী মনে করে?' রাম তুতলিয়ে বলল, 'আ-আ-আ এম ভেরি স-স-সরি, আপনার মেয়েকে নিয়ে যেতে এসেছি।' কিন্তু জনকতো সোজা বলে দিলেন সীতাকে তিনি পাঠাবেন না।

রাম খবর দিল যে, হনুমানের হাঁটুর ব্যথা বেড়েছে। নি-ক্যাপ, সন্ধিসুধা, রামদেবের মলম, বাজার কাটতি ব্যথা নিরোধক সে-সব ফেল। লক্ষ্মণের তো আবার ভাইরাল ফিভার। আবার রাবণ তো রামের এগেনস্টে কেস ঠুকেছে, প্রতারণা করার উদ্দেশ্য। ওই জন্য কোর্ট কাছারি করতে হচ্ছে। তাছাড়া নিজেরও তিন চার দিন আগে লুজ মোশান হয়েছিল।

জনক তো রেগে বললেন, 'তাই ওকে খাটানোর জন্য নিয়ে যেতে এসেছ?' রাম সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানাল, 'না, না, ওকে কিচ্ছু করতে হয় না। একটা কাজের লোক রাখা হয়েছে, সে-ই সব করে' রাম জনকের এক্সপ্রেশন দেখে অভিমান ভেজা গলায় বলল, 'গ্যাসের খুব ক্রাইসিস চলছে, কয়লা জোগাড়েও প্রবলেম। আমাদের বিয়েতে পাওয়া ইনডাকশন ওভেন আর তার সরঞ্জাম

গুলো কোথায় আছে বলে দাও, এখনি চলে যাচ্ছি। থকিং করে কারেন্ট আনা হয়েছে, যা হোক করে চালিয়ে নেবো আমরা।'

সীতা আর থাকতে পারে না, বলে উঠল 'ও জিনিসগুলো লবণের তক্তার নিচে আছে। আরশোলা ও মাকড়সার ভয়ে কাপড় জড়িয়ে রেখেছি। কিন্তু আমি ছাড়া কেউ ব্যবহার করতে জানে না ওর, তাই আমিও সঙ্গে যাবো।' তারপর বাবাকে বলল, 'বাবা আমাকে যেতে দাও। এরা তো আমাকে মেন্টালি বা ফিজিক্যালি কোনোভাবেই টর্চার করে নি, তাছাড়া কোনদিনও তোমার কাছে ডাউরি ডিমাণ্ড করে নি, বাড়ি নেই বলে ফ্ল্যাট কিনে দিতে বলেনি।'

সীতার একথা শুনে জনক তো আইসক্রীমের মতো গলে জল হয়ে গেল ও তাকে রামের সাথে পাঠাতে রাজি হয়ে গেলেন। সীতা রেজি হয়ে মিথিলা এক্সপ্রেস ধরে রামের সঙ্গে জঙ্গলমহলে পৌঁছে গেল। এই ভাবেই চোদ্দ বছর রাম-সীতার বনবাস কাটিয়ে দিল।

তথ্য

বিষয় ঃ মাংসাসী প্রাণীদের ঘাস খাওয়া

— সুমন রায়
(ভূগোল-সাম্মানিক, তৃতীয় বর্ষ)

আমরা প্রায় প্রত্যেকেই জানি যে, ঘাস সাধারণত গরু, ছাগল প্রভৃতি প্রাণীরা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে কিন্তু মাংশাসী প্রাণী যেমন কুকুর থেকে শুরু করে বাঘ, সিংহ প্রভৃতিরাও ঘাস খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। এর কারণ হল - তারা গুরুপাক জাতীয় খাদ্যগ্রহণের পর বমি করার জন্য ঘাস খায়। তবে তারা ঘাস ভালোভাবে না চিবিয়ে খায় কারণ ভালোভাবে চিবিয়ে খেলে তা হজম হয়ে যেতে পারে। তাই তারা ভালোভাবে না চিবিয়ে খায় তাতে বমির আশঙ্কা জাগে এবং তারা বমি করে। কিন্তু শুধু বমি করার উদ্দেশ্যেই যে তারা ঘাস খায় তা নয় সুন্দর গন্ধের আকর্ষণেও তারা তা খেয়ে থাকে।

অনেক প্রাণীবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে এটি উত্তরাধিকার সূত্র থেকে পাওয়া। আমেদাবাদের কমলা নেহেরু চিড়িয়াখানায় তা দেখতে পাওয়া গেছে। পশু চিকিৎসক ও বিজ্ঞানিরা মনে করেন যে ঘাসে থাকা তন্তু ও অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকার জন্য এছাড়া Vitamin-E থাকে যা তাদের লোম ও স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই উপযোগী।

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাওয়া তথ্য থেকে জানা যায় যে মাংশাসী প্রাণী 74% পাকস্থলিতে ঘাস থাকে, যা তাদের পেটে থাকা ক্রিমিকে ধ্বংস করে তাই একে ক্রিমিনাশকও বলা হয়।

তবে যদি ঘাসে বিষক্রিয়া থাকে বা ঔষধ মিশ্রিত থাকে তা হলে তা খেয়ে মাংশাসী প্রাণীর মৃত্যু হতে পারে। তাই হিন্দিতে একটা প্রবাদ আছে যে 'শের ভি কভি ঘাস খাতা হায় ক্যা?' এই প্রবাদ কিন্তু মিথ্যে প্রমাণিত হয়েছে।

দার্জিলিং ও গ্যাংটক

— বিশ্বনাথ চন্দ্র ও সুরজিৎ পাল
(ভূগোল-সাম্মানিক, দ্বিতীয় বর্ষ)

আজও এক সবুজ রহস্যের আবরণ ঘিরে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের পাহাড়ময় ভূ-খণ্ড দার্জিলিংকে। ছোটো বড়ো নানান পাহাড় নিয়ে গড়ে ওঠা দার্জিলিং প্রকৃতির এক বিচিত্র লীলাভূমি। পাহাড়, পর্বত, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে দার্জিলিং যেন অদ্বিতীয়। শুধু পর্যটক নয়, প্রকৃতি প্রেমিক সমস্ত মানুষ বারবার ছুটে এসেছে এই পাহাড় রাণীর কোলে।

আমরা সোনামুখী কলেজের ভূগোল বিভাগের ছাত্র। হঠাৎ ঠিক করা হল এবার আমরা যাব দার্জিলিং-গ্যাংটক। জীবনের প্রথম পর্যটন। তাই প্রথম থেকেই জায়গাটাকে দেখার তাড়াহুড়ো ছিল। তাই সময় নিয়ে রসিয়ে উপভোগ করা গেল দেশটা। দুচোখ ভরে প্রকৃতির সেই রূপ দেখে আমরা মুগ্ধ। ভাললাগার মনে উপচে পড়ছে আনন্দের জোয়ার।

দার্জিলিং যাবার কথা শুনে সবাই হাঁ হাঁ করে উঠল। কেউ কেউ বলল বাসে, আবার কারো মুখে এল ট্রেণের কথা। যাইহোক বাসে যাওয়ার ঝুঁকি না নিয়ে আমরা ট্রেনে যাবার কথায় ঠিক করলাম। বাড়ির লোকেদের টা-টা করে দিয়ে উঠলাম সেহারাবাজার গামী ট্রেনে। দিনটা ছিল সম্ভবত মঙ্গলবার। সেহারাবাজার থেকে এলাম বর্ধমান। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে গিয়ে উঠলাম জলপাইগুড়ি গামী ট্রেনে রাত্রি ৯টা নাগাদ। বর্ধমান থেকে ট্রেন ছাড়ল ধীর গতিতে। আলো ঝলমলে বর্ধমান ধীরে ধীরে হারিয়ে গেল অন্ধকারের আড়ালে। ট্রেনে উঠে গল্প গুজব করলাম। তারপর মাথা গুঁজলাম নিজের নিজের সিটে। রাত্রি ১২টা, সবাই ঘুমোচ্ছে। হঠাৎ আমাদের মধ্যে একজন এসে বলল এবার ওঠো। আমি ও সুরজিৎ ভাবলাম এত তাড়াতাড়ি জলপাইগুড়ি পৌঁছে গেলাম! তারপর শুনলাম সীটের গণ্ডগোল হয়েছে। ব্যাস যেই ভাবা সেই কাজ। দুজন বসলাম একটা সিটে। সে সিটে একজন বসা দায় তাতে আবার দুজন। ভাবুন একবার অবস্থাটা। সারারাত আসতে হল বাদুড় ঝোলার মতো। জলপাইগুড়ি পৌঁছালাম সকাল ৭টা নাগাদ। তারপর গিয়ে উঠলাম গাড়িতে। রওনা দিলাম দার্জিলিং এর পথে। যাওয়ার পথে আমরা দেখলাম মিরিক লেক। মিরিক এর আবহাওয়া ও সেখানকার প্রকৃতি দেখে মনটা আনন্দে ভরে গেল। ছবিও তোলা হল প্রচুর। কখনো স্যারদের সাথে আবার কখনো একা। তারপর আবার চলতে লগাল গাড়ি। রাস্তার ধারে একটা রেস্তরায় কিছু খেয়ে নিয়ে আমরা নেপাল সীমান্তে পৌঁছালাম। সীমান্ত পেরিয়ে পা রাখলাম নেপালের মাটিতে, সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। নেপালের আরো ভিতরে যাবার ইচ্ছা থাকলেও স্যারদের হস্তক্ষেপ আমাদের নিরস্ত্র করল। আবার চলতে লাগল গাড়ি। গাড়ির জানালার বাইরে মনে হল নীল-সবুজের খেলা চলছে। সেই খেলায় যোগ দিয়েছে বিভিন্ন রঙের

মেঘ আর সোনা রঙের রোদ্দুর। পথের ধারে শুধুই চোখ জুড়িয়ে দেওয়ার দৃশ্য। এইভাবেই শামুকের গতিতে দার্জিলিংয়ে যখন এসে পড়লাম তখন কাঁচা সোনার মতো দুপুর বিকেলের দিকে একটু একটু করে ঢলে পড়ছে।

দার্জিলিং মানে এক অদ্ভুত নস্টালজিয়া। ধবধবে কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে তাকিয়ে বুকের ভিতরে লুকিয়ে থাকা এক দুর্বার রোমান্টিকতা প্রতিবার জেগে উঠেছে ফিনিক্স পাখির মতো। এই নিরন্তর ভেসে বেড়ানো সাদা মেঘের ভেলা, এই সবুজ পাইন্ গাছের বনানী, এই উজ্জ্বল নীল আকাশ, এই মন ভালো করে দেওয়া মিঠে আবহাওয়া এর তুলনা নেই। আমরা যে হোটেলটায় উঠেছিলাম তা খুব একটা বড় না হলেও, এদের ব্যবহার খুব ভালো। হোটেলে গিয়ে ব্যাগ-পত্তর রেখে ফ্রেশ হয়ে নেওয়া গেল। বিকেলের আয়ু তখনও বাকি থাকলেও সেই বিকেলটা বাইরে না বেড়িয়ে ঘুমিয়ে কাটালাম। পরদিন সকালে উঠে দেরি না করে বেরিয়ে পড়লাম ম্যালের দিকে। অর্ধেকদিন তো কেটে গেলো ম্যালে। ছবি তোলা হল দেদার। সেসব পর্ব চুকিয়ে গল্প করতে করতে ম্যালের পিছন দিকে হেঁটে আসা হল এক রাউণ্ড। এখানে ঘুরতে ঘুরতে আশ্চর্য কিছু তথ্য জানতে পারলাম। দেখে এলাম সেই বাড়ি যেখানে মারা গিয়েছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। এমনকি লেকং এর রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে জানা গেল এখানে নাকি ভগিনী নিবেদিতার বাড়ি ছিল। পরদিন সকাল বেলা কাঁচা ঘুম থেকে উঠে যাওয়া হল টাইগার হিলে। কপাল ভালো সূর্য ওঠা দেখা গেল মেঘেদের বিপত্তি ছাড়াই। তবে যে বিপত্তি ঠাণ্ডা সৃষ্টি করেছিল তা অন্যকিছু সৃষ্টি করতে পারত না। একই সাথে ঘুরে এলাম বাতাসিয়া লুপ ও ঘুম মনেস্ট্রি। তিনদিনের মধ্যে দার্জিলিং এর দেখার মতো সব জিনিস সাবাড় করে ফেললাম। সেই দিনেই রওনা দিলাম গ্যাংটকের উদ্দেশ্যে। সন্ধ্যা নাগাদ পৌঁছালাম গ্যাংটকে। সেই রাতটা বিশ্রাম করে কাটালাম। পরদিন বেড়িয়ে পড়লাম পায়ে হেঁটে বনজ্ঞাকরী ওয়াটার ফলস দেখতে। রাস্তায় যেতে যেতে দেখলাম মস্ত বড় Stadium। সেখানে ছবিও তোলা হল খানিক। তারপর আবার হাঁটা। প্রায় ৪ / ৫ কিমি হাঁটার পর পৌঁছালাম গন্তব্যস্থলে। সেখানে মিউজিয়াম, মন্দির দেখলাম। কিন্তু সবথেকে ভালো লাগলো ওখানের ঝরণা। ঝরণার নীচে দাঁড়িয়ে ছবি তুললাম সকলে এমনকি স্যারেরাও। মনে মনে ভাবলাম এতটা রাস্তা গাড়িতে এলে খরচটা একটু বেশিই হত। যাইহোক, পয়সাটা বেঁচে গেল। কিন্তু ফিরবার পথে পায়ের অবস্থা বেহাল। অনেক কষ্ট করে হোটেলে এলাম। খাওয়া-দাওয়া করে ঘুম। সন্ধ্যার দিকে গেলাম গ্যাংটক মার্কেটে। সত্যি আলো ঝলমলে সব দোকান ও জিনিস দেখে চোখ ধাঁধিয়ে গেল। কেনাকাটাও করলাম প্রচুর। রাত্রে হোটেলে ফিরে এসে খাওয়া দাওয়া সেরে স্যারদের রুমেতে অনুষ্ঠানও হল। কেউ নাচ, কেউ গান - যে যা পারল তাই করল। পরদিন রওনা দিলাম Rope Way চড়বার উদ্দেশ্যে। উদ্দেশ্য পূরণও হল বিনা বাধায়। ফিরে এলাম হোটেলে। এতো আনন্দের মাঝেও মনের কোণে কোথাও যেন একটু দুঃখও হতে লাগল এই ভেবেই এরপর ফিরে যেতে হবে। গ্যাংটককে বিদায় জানিয়ে আমরা গাড়ি ধরলাম জলপাইগুড়ির উদ্দেশ্য। গাড়িতে যাবার পথে রাস্তার দুধারে সবুজ পাইনের বন। ধুলো, কালি আর দূষণের রাজত্বে ফিরে যাবার আগে বুকভরা অক্সিজেন নিয়ে নিলাম সবাই। আমরা গল্পগাছায় মাঝে কখন যেন পেরিয়ে এলাম সেই বন। পৌঁছে গেলাম জলপাইগুড়ি। বিকেল ৫-৩০ নাগাদ উঠে গেলাম ট্রেনে। এবার ফিরতে হবে আমাদের। সব ভালো কিছুই একসময় শেষ হয়ে যায়। আর দেরি নয়। আমাদের সেই কংক্রীটের শহর এখান থেকে আরও ঘণ্টা চারেক দূরে।

মনের মানুষ

— ঐমীর বাউরী
(ইংরেজি-সাম্মানিক, প্রথম বর্ষ)

ছোটোবেলায় শুনেছি শুশুনিয়া পাহাড়ে বিরাট বিরাট ময়াল সাপ আছে। এইসব সাপেরা এক নিশ্বাসে একটা গোরু বা ছাগল মুখের মধ্যে টেনে নেয়। এখানে একটা সুন্দর ঝরণাও আছে। পাহাড়টি দেখার ইচ্ছায় অবশেষে বহু আঁকাবাঁকা পথ অতিক্রম করে পৌঁছালাম এই নীল পাহাড়ে। পাহাড়টি দেখতে বেশ সুন্দর। পাহাড়িয়া জঙ্গল ভয়ানক ও দুর্গম হয় শুনেছি, তা প্রত্যক্ষভাবে কিছুটা উপলব্ধি করলাম। তবে যাইহোক না কেন, পাহাড়ে রয়েছে ঝোপঝাড়, বিভিন্ন লতা গুল্ম ছাড়াও বিভিন্ন ফুলের গাছ রয়েছে। ফুলের সুগন্ধে চারিদিক মুখরিত, আনন্দিত। সূর্যের আলো কোথাও সরাসরি ভূপৃষ্ঠে, কোথাও বা গাছের ডালপালার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে। সব থেকে বেশি কৌতুহলী হল এখানকার ঝরণা। ঝরণাটি উপর থেকে নীচে নামতে নামতে কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে বলে মনে হয়। এই নদীর জলে বিভিন্ন ফুল ভেসে যাচ্ছে- মনে হয় কেউ যেন এই নদীর জলে ফুল ছড়িয়ে দিচ্ছে।

অবশেষে এসব দেখতে দেখতে পাহাড়ের উপরে উঠে আমি হাত পা ছড়িয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম। মনে হচ্ছিল প্রথম পাহাড়ে উঠা নয় যেন এভারেষ্ট জয় করছি। তাই আনন্দকে আর চাপা রাখতে না পেরে বললাম - হে প্রভু। তোমার নিজ হাতে গড়া এই পৃথিবী কত সুন্দর তা কিছুটা আজ উপলব্ধ করলাম। তুমি আমাকে সাহস ও শক্তি দাও যেন পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ আমি প্রত্যক্ষ করতে পারি। না হলে রয়ে যাবে অজানাকে জানার চির আকাঙ্খা, চির কৌতুহল।

এমন সময় দেখলাম একটি মেয়ের পা কেটে রক্ত বেরোচ্ছে। হয়ত সে -ও প্রথম। আমি তার কাছে গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা করলাম এবং বললাম পাহাড়ে চড়তে গেলে সদায় সচেতনতা অবলম্বন করবে। এভাবে কথোপকথনের মধ্যে উভয়ের মধ্যে পরিচয় হয়। কিছুক্ষণ পর আমরা উঠে পড়লাম। মৌমিতা আমার পিছু পিছু আসতে লাগল এবং সে ছিল বড়ই আনমনা। বারবার হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছে দেখে বললাম-- তুমি এত অসচেতন কেন? পথের দিকে তাকাও। আর কিছু বললাম না।

পাহাড়ের নীচে নামার পর আমাকে অত্যন্ত অনুরোধের সুরে তার বাড়ি যেতে বলে। আমর ইচ্ছা না থাকলেও যেতে হয়। বাড়ীতে সকলের সাথে মৌমিতা পরিচয় করিয়ে দেয়। তার পিতা শঙ্করপ্রসাদ রায়চৌধুরী বলেন - এই বংশের একটা নিয়ম আছে, অতিথির যেন যথেষ্ট সেবা করা হয়। আতিথেয়তার পর শঙ্করবাবু আমাকে কয়েকদিন থাকার জন্য অনুরোধ করেন। তাঁর কথা কাটতে পারলাম না। সন্ধ্যা বেলায় সকলে মিলে আড্ডায় বসলাম। মৌমিতা বারবার এদিকে তাকাতে লাগল। না পারছে কিছু বলতে, না পারছে কিছু ভালভাবে শুনতে। সে চঞ্চল হয়ে কেবল এদিক ওদিক তাকাতে আরম্ভ করে। এর কারণটা আমি বুঝতে পেরেও চুপচাপ থাকলাম। কারণ- মনটা একবারই দেওয়া যায় কোনো মনের মানুষকে- তা যদি ভালোলাগার বসে হারিয়ে ফেলি তবে জীবনকে ভুল পথে ঠেলে দেওয়া হয়।

ডিনার শেষে আমি নিজ রুমে আসি। কিছুক্ষণ পর কেউ দরজায় টোকর দেয়। আমি দরজা খুলতেই দেখি মৌমিতা এসে হাজির। আমি

অবাক হয়ে বললাম এত রাত্রে তুমি আমার ঘরে, পেরিয়ে এসো। সে পেরিয়ে এসে চেয়ারে বসে বলল - তুমি কোনো মেয়েকে ভালোবাসো?

মৌমিতা ভালবাসা আর ভালোলাগা কখনো এক নয়। যে কোনো বস্তু বা কাউকে ভালো লাগতে পারে কিন্তু ভালোবাসার জন্য একজন মনের মানুষ প্রয়োজন। অন্তরের সাথে অন্তরের মিলন ঘটানোর মতো কোনো মেয়েকে আমি দেখতে পাইনি। তার একথা জানার কারণটা পরিস্কার হয়ে গেল তার মাথাটি নিচু করে আধো লজ্জা আধো হাসি মুখে এমন কথা বলার সাথে সাথে আর এটাও পরিস্কার হয়ে গেল কেন সে বারবার হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল। বললাম মনে হচ্ছে তুমি কারো প্রেমে পড়েছো। সে হঠাৎ হাসলো কিন্তু কিছু বলল না।

দেখো আমি সকলের সাথে বন্ধুত্বের মতো ব্যবহার করি। তুমি আমায় সবকিছু খুলে বলতে পারো। একথা আমার কাছে শুনে যেন কিছুটা সাহস পেয়ে কিছু বলতে গেল কিন্তু বলল না। বলল পরে বলব এখন থাক। এই বলে হাসতে হাসতে চলে গেল।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে আমি বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হলাম। এখানে এসে আমার খুব ভালো লেগেছে। মৌমিতার কথা রাখতেই এখানে এসেছিলাম। না এলে বুঝতেই পারতাম না এখানে আপনাদের মতো একত্র পরিবার আছে। আপনাদের মতো ভালো মানুষ আছে। তবে শঙ্করবাবু আপনার মেয়েকে তো দেখছি না--এই বলছিলাম--

এক দাসী বলল দিদিমণি উপরের ঘরে আছে। আমার দেখা করা অবশ্যই কর্তব্য বলে দেখা করতে যাই। দেখি সে দরজা বন্ধ করে একাই গুমরে কাঁদছে। আমাকে দেখা মাত্রই চোখের জল মোছার চেষ্টা করল। আমি সব লক্ষ্য করলাম।

মৌমিতা আমি বাড়ি ফিরে যাচ্ছি। তোমাকে দেখতে না পেয়ে চলে এলাম।

মৌমিতা ঃ চলে যেতেই পারতে। দেখা করতে আসার কি দরকার ছিল? মিথ্যা দেখা করতে এসে কষ্টের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছ।

আমি বললাম- একি মৌমিতা তুমি কাঁদছো? আমি বাড়ী যাচ্ছি বলে তুমি কাঁদছো কিন্তু কেন?

মৌমিতা ঃ কেন তুমি এখানে এসেছিলে, না আসতেই পারতে। জীবনে প্রথম কাউকে দেখেছিলাম ভালো মানুষ হিসাবে। সেও অতিথির মতো চলে যাবে আমি ভাবিনি।

আমি এখন বুঝতে পারলাম - কেন এত চঞ্চল হয়ে উঠেছিল আমার সাথে সাক্ষাতের পর। আমার সেই সহানুভূতি তার কাছে আজ আকর্ষণের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এত সহজে আমি কারো কাছে ধরা দিতে চাইনা। তাই বললাম- ছেলে মানুষি করো না। দেখো অতিথি আসবে যাবে - চিরদিনের জন্য নয়। এই বলে সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছি তখন বিছানা থেকে উঠে আমার হাতটা টেনে ধরে। কিছু বলতে গিয়েও বলে না। আমি হাতটা ছাড়িয়ে নিলে সে কেঁদে ফেলে। তার বুক ফেটে যায় কিন্তু মুখ ফোটে না। অবশেষে সে বলল- তুমি চলে যেওনা। আমি তোমায় ভালোবাসি। প্লিজ তুমি চলে যেওনা। তুমি চলে গেলে আমি কী করব?

তবে যাইহোক সে কান্নার সুর আমার হৃদয়কে কিছুটা নাড়া দিয়েছিল। বাড়ি ফিরে এসে কোনো কাজে মন বসে না। একটাই প্রশ্ন - তার কান্নার সুর ভালোলাগা না ভালোবাসা ছিল? আমি আজও সেই উত্তরের অপেক্ষায়। হতভাগ্য সেই নারীর বেদনার চাপা সুরের কাছে এই সুর মধুর রসে পূর্ণ হবে। একথা ভাবতে ভাবতেই সে আমার বাড়ীতে এসে উপস্থিত। এখন বুঝলাম সেই একমাত্র মনের মানুষ।

কিংবদন্তী সংগীত শিল্পী মান্না দে-র স্মরণে

— শঙ্কর দাস

ভারতবর্ষের বিখ্যাত কিংবদন্তী সংগীত শিল্পী মান্না দে-র গান আমাদের মনকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। আমার প্রিয় শিল্পীর গান মনকে মাতিয়ে তোলে। বাংলা গান, হিন্দী গান, ভক্তিগীতি, গজল সকল গানে তিনি সম্রাট ও সুর, তাল ও লয়ে তিনি একজন সংগীত সাধক। আজ তিনি আমাদের মধ্যে নেই তবু তিনি বেঁচে থাকবেন বাঙালীর মনে।

অল্প বয়সে তিনি পড়াশোনা শেখার সাথে সাথে ওনার কাকার কাছে সংগীত চর্চা করতেন। তারপর সেই সময়কার বিখ্যাত গায়ক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র তখন মধ্যগগনে। একটার পর একটা গান হিট করছেন, সকলের মনকে জয় করছেন। ঠিক সময়ে প্রথমবার গেয়ে ফেললেন এ্যান্টনি ফিরিঙ্গির সেই বিখ্যাত গান- আমি জামিনি তুমি শশীহে ভাতিছ গগন মাঝে। এই গান প্রতিটি সংগীতপ্রেমী মানুষের মধ্যে সমানভাবে গাঁথা আছে। এবং এই গান দিয়েই তিনি পরিচয় দিলেন যে তিনি কোন সাধারণ গায়ক নন। তারপর, আমি যে জলসাঘরে ....।

বাংলা গানে মান্নাবাবু একটার পর একটা গান গেয়েছেন। যেটাই গেয়েছেন সোনা হয়ে গেছে, মন মুগ্ধ হয়ে গেছে।

অজস্র ছায়াছবির গান গেয়েছেন। ওনার গাওয়া বিখ্যাত সেই গান 'কফি হাউসের অড্ডাটা আজ আর নেই, আজ আর নেই।'

বাংলা থেকে যখনই হিন্দি গান গাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন তখনই তার যোগ্য দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, তিনি কত বড় মাপের সংগীতশিল্পী। তার গাওয়া হিন্দীগান- জিন্দেগী ক্যায়সী হ্যায় পেহেলী হ্যায়। এ্যা মেরী জহরাজ্যারি। এ্যাক চুতরনার ব্যাড়া হোসিয়ার - আমাদের প্রত্যেককে ভীষণভাবে মুগ্ধ করে।

সত্যিই তিনি আমাদের কাছে একজন সংগীত জগতের বিশাল নক্ষত্র। যার কোন শেষ নেই। মান্না দে বেঁচে থাকবেন ওনার গানের মধ্যদিয়ে, যদিন পৃথিবী থাকবে তত দিন তাঁর গান অমর হয়ে থাকবে এবং তিনি বেঁচে থাকবেন।

মান্না দে এমন একজন সংগীত সম্রাট, যার কোনো তুলনা হয় না। এখনকার বিভিন্ন সংগীত শিল্পীরা যদি মান্না দে'র মতো সংগীত শিল্পীকে অনুসরণ করেন যদি তাকে দেখে কিছু শেখেন তাহলে আগামী সংগীত জগত খুবই ভালো হবে।

আমরা যতই নতুন গান শুনি বা নতুন চলচ্চিত্রের ছবি দেখি পুরাতন গান, ছবি আমাদের কাছে চরম সম্পদ। এগুলো ছাড়া বাংলা অচল। তাই সবশেষে একটা কথা বলি - মান্না দে'র গান চিরকাল বাঙালী অন্তরে থাকবে।

"মুটুকটা পড়ে আছে, রাজাই শুধু নেই ....।"

সমরাজ্ঞাণে

— এস.কুমার

বেলভিউ আত্মগবেষণাগার।

আমরা যারা দুঃখ ও যন্ত্রণায় আছি, তারা এক নৌকার সওয়ারী,
একে অপরের দুঃখের ভাষা আমরা ছাড়া আর কেউ বুঝতে নারি।
এই নৌকার মাঝি দুঃখ হরণ, বিপদ তারণ হয়েও এখন অপেক্ষমান,
কারণ আমরা সবাই ষোল আনা দিয়ে নইতো এক মন সমান।
সময় যে লাগে তার ভারে আক্রান্ত মনকে শুকাতে তীব্র দহন তাপে,
আবার কখনো হালকা মনকে প্রেমরসে ভরে রাখতে দেহের চাপে।
বেদনা কাতর যত ভাই সব হয়োনা অবুঝ জীবন মাঝির প্রতি,
সময়তো কেটে যাচ্ছে ধীরে ধীরে, শূন্য হাতে এসে কিবা তব ক্ষতি?
শোনরে মানুষ ভাই, শোনাব এক নূতন কথা যদি সেই সময় পাই,
এত মারামারি, ইজ্জত নিয়ে কাড়াকাড়ি, বিবেকহীনের বাড়াবাড়ি হবে যাচাই।
ভাবিসনা দুধ পুকুরে জল ঢালিলে দেখার কেহ নাই, ভাবিসনা রে পাজি,
কতটা দুধে, কতটা জল, সোনায় কতটা মল তুই ছাড়াও জানে বিবেক মাঝি।
কলিযুগে অধিকাংশ নারীই অভিনব মেনিয়া মহামারি রোগের কবলে,
চোখের নাচনে, বাত সঞ্চালনে, ব্যাধিভিপো সহ মুখে বড় বড় বাত সম্বলে।
আপনকে করতে পর, পরকে করতে আপন নেই তাদের জুড়ি,
গড়া সংসার ভাঙতে, ভুল বোঝাতে এমন নিদর্শন ভুরি ভুরি।
তিলকে তাল করতে, দিনকে রাত বানাতে তারা ভীষণ নাটক পটিয়সী,
গাছে তুলে মই কাড়তে, এককে ছেড়ে অপরকে ধরতে অদ্ভুত মহিয়সী।
এ জগতে অধিকাংশ নারীর স্বেচ্ছাচারিতা বলিহারী,
ঘরোয়া যুদ্ধ থেকে বিশ্বযুদ্ধের কেন্দ্রে কি নেই কোন নারী?
মুণির তপস্যা ভাঙাতে উর্বশী মেনকা হয়েছে সফলকাম,
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পটভূমিকায় উঠে আসে দ্রৌপদির নাম।
তবুও বিধাতার হাত বাঁধা, কলম খোলেনা বিচারের লিখনে,
কারণ একমাত্র নারীই সফল হয়েছে ব্রহ্মার তৃষ্ণা নিবারণে।
হয়কে নয়, নয়কে হয় বানানোই মায়া, যা কেবল নারীর ভূষণ,
এই ভূষণে ভূষিত দেখে স্বর্গের দেবতারাও করেন নারীর তোষণ।

হে নারী, ভেবোনা আমি নারী বিদ্বেষী, আমিও বন্দনা করি সেই নারী,
যে নারী স্বামী ছেড়ে হয় না কৃষ্ণ অভিসারী, অর্থাৎ নয় সে রাধা অনুসারী।
আমার আদর্শ নারী আইরিশ রমনী মার্গারেট, যে ভারতের ভগ্নী নিবেদিতা,
ভারতের আদর্শ নারীর তালিকায় আমার কাছে সতী সাবিত্রী, সারদা ও সীতা।

স্বপ্ন

—অপর্ণা ঘোষ
(ইংরেজি-সাম্মানিক, প্রথম বর্ষ)

দিনটা শরৎকালের এক বুধবার। দুর্গাপূজার ছুটি সবেমাত্র শুরু হবে আগামি কাল থেকে। আগামি কাল থেকে স্কুল ছুটির ফলে পড়াশোনা কিছুদিন বন্ধ থাকবে, এই মজায় রিমা আনন্দের সাথে আজ স্কুলে গেল। রিমা ক্লাই X এ পড়ে। স্কুল থেকে ফিরে তার একটাই অভ্যাস তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে কাবাডি খেলতে যাওয়া।

কিন্তু আজ তার আর খেলায় মন নেই। শরীর যেন আজ তার সাথ দিচ্ছে না। স্কুল থেকে ফিরে মুখ হাত ধুয়ে কিচু খাবার খেয়ে সে শুয়ে পড়ল। রিমার মা খুব চিন্তিত। কি ব্যাপার! মেয়ের কী শরীর অসুস্থ?

আজ সাত বছর হল রিমার বাবা বাড়িতে নেই। রিমার বাবা অসীমবাবু সাত বছর আগে সীমান্ত রক্ষী সৈন্য হিসাবে কাজ করতে গিয়েছিলেন। প্রথম ৩-৪ বছর চিঠি ও টাকা আসত। কিন্তু এখন কোনো খবর পাওয়া যায়নি বিগত ৩ বছর ধরে। রিমার মা অন্নপূর্ণাদেবী রিমাকে অসুস্থতার কারণ জিজ্ঞাসা করতে সে উত্তর দেয় "তুমি কিছু ভেব না মা, আমি একটু বিশ্রাম করি, ,সব ঠিক হয়ে যাবে"। এই শুনে অন্নপূর্ণা দেবী রিমার গায়ে চাদরটি বেশ করে জড়িয়ে শুইয়ে দিয়ে পাশের বাড়িতে চলে গেল কোনো কাজে।

কিছুক্ষণ পর হঠাৎ রিমা শুনতে পেল বাড়ির দরজায় কেউ আঘাত করছে। রিমা ছুটে গেল দরজার কাছে, ভাবল মা বুঝি ফিরে এল, কিন্তু দরজা খুলে সামনের ভদ্রলোকটিকে দেখে কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায় সে। ভাবতে চেষ্টা করে এই মানুষটিকে সে আগে কখনও দেখেছে কিনা। হঠাৎ রিমার চোখে অস্পষ্ট ছবি ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠে। পলক ফেলতে না ফেলতে অস্পষ্ট স্বরে বলে ওঠে 'বাবা'। এসেছেন অসীমবাবু এই ৭টি বছর পর। অসীমবাবুকে দেখে স্তব্ধ হয়ে যান। দু-চোখ দিয়ে শুধু অশ্রু ঝরে পড়তে থাকে।

রিমা তো খুব খুশি। এই পেরিয়ে আসা সাতটি বছরের সে তার বাবার সাথে পুজা কাটাতে পারেনি। এই বছর ঠিক পুজোর কয়েকদিন আগে তার বাবা, মা উভয়কেই একসাথে পেল। দুর্গাপূজার ষষ্ঠীর দিন বাবার কাছে বায়না ধরল মেলা দেখতে যাওয়ার। অসীমবাবু মেয়েকে নিয়ে গেলেন পাশের গ্রামে মেলা দেখতে। সেখানে এক ম্যাজিসিয়ান এসেছে ম্যাজিক দেখাতে। রিমা খুব আনন্দ করে ম্যাজিক দেখল, তারপর ম্যাজিক ওয়ালা এর সাথে পরিচয় করল। এই দুষ্টু মিষ্টি মেয়েটির প্রতি খুশি হয়ে ম্যাজিকওয়ালা রিমকে একটি সাদা ম্যাজিক বল উপহার দিলেন। আর একটি মন্ত্র শিখিয়ে দিলেন। আর বলল এটি তিনবার বললে সামনে উপস্থিত হবে একটি 'ম্যাজিক রথ'। ফিরে আসার পথে অসীমবাবু রিমার কথা শুনে হাসতে থাকলেন। রিম সারা পথ ঐ মন্ত্রটা মনে মনে জপ করতে করতে বাড়ি ফিরল।

কিছুদিন পর এক বিকালে আনমনাভাবে বসে ছিল। হঠাৎ মনে পড়ল সেই ম্যাজিক মন্ত্র। সেই মন্ত্র তিনবার উচ্চারণ করতেই ব্যাস্! রথ হাজির। রিমা উঠে পড়ল রথে। রথ উপরে উড়তে লাগল। উপরে-উপরে অনেক উপরে। এসে গেল স্বর্গে। সেখানে নর্তকীরা নৃত্য করছে দেবরাজ ইন্দ্র সহ অন্যান্য দেবদেবীদের কাছে।

রিমা সকৌতুহলে এগিয়ে গেল দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে। রিমা সবার সামনে একটি গান গেয়ে শোনাল। গান শুনে দেব-দেবীরা খুবই প্রসন্ন হল। প্রসন্ন চিত্তে দেবরাজ থোড়াে রিমাকে একটি পদ্মফুল দিলেন। রিমা সকলকে প্রণাম জানিয়ে আশীর্বাদ নিয়ে সেই রথে আবার ফিরে এল তার বাবা, মায়ের কাছে। অসীমবাবু ও অন্নপূর্ণাদেবী রিমাকে আদর করে জড়িয়ে ধরলেন। কিন্তু হায়.... এটা ছিল একটা স্বপ্ন।

অন্নপূর্ণা দেবীর ঝাঁকুনিতে রিমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে চোখ খুলে দেখল তার কাছে তার বাবাও নেই, আর সেই ম্যাজিক রথও নেই। কিন্তু তার হাতে রয়েছে সেই পদ্মফুল। রিমা তো অবাক! যদি এটা স্বপ্ন, তাহলে পদ্মফুল এল কীভাবে?

আসলে রিমার মা পাশের বাড়ী থেকে পদ্মফুল নিয়ে রিমার হাতে দিয়ে বললেন, 'রিমা ঘুম থেকে ওঠ মা, হাত মুখ ধুয়ে পাশের পাড়ার দুর্গা ঠাকুরের পায়ে ফুল দিয়ে প্রণাম করে আয়, তারপর ফিরে এসে গানের রেওয়াজে বসবি।' মুখ হাত ধুয়ে রিমা পদ্মফুল হাতে নিল, সে তার স্বপ্নের কথাটা তার মা'কে বলতে যাচ্ছিল কারণ সে তার বাবাকে স্বপ্নে দেখেছে। বাবাকে সে ভুলে নাই। সাত বছরের আগের মুখটা এখনো তার মনে আছে। রিমা বলতে যাচ্ছিল আর ঠিক তখনই বাড়ির দরজায় আবার আঘাতের আওয়াজ লে। রিমা ছুটে গেল দরজা খুলতে, মনে আবার আশার সঞ্চার ঘটল, সাত বছর পর তার বাবা বুঝি ফিরে এসেছে। হ্যাঁ সত্যি, তার বাব ফিরে না এলেও খবর পাওয়া গেছে। কিছু পুলিশসহ কিছু সৈন্য এল। তারা খবর দিল অসীমবাবু গত দুবছর আগে যুদ্ধে মারা গেছেন। মৃত্যু সংবাদটা আসতে দেরী হয়ে যায় তার বাবার জমানো কিছু টাকা এবং একটি পেন ও ছোট্ট চিঠি পেল। এই চিঠিতে লেখা আছে রিমাকে নিয়ে কিছু আশা-আকাঙ্খার কথা। রিমা চিঠিটা পড়ল, তারপর সযত্নে পেন ও চিঠিটা নিজের কাছে রেখে দিল।

রিমা তার মা'কে আর তার স্বপ্নের কথা বলতে পারল না এবং নিজেও কিছু ভাবতে পারল না। দুর্গাপুজোর পঞ্চমীর ঢাকের আওয়াজে সব তখন গোলমাল হয়ে গেল।

বাঁকুড়ার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

— শান্তনু নন্দী
(দর্শন-সাম্মানিক, দ্বিতীয় বর্ষ)

ভাগীরথীর পশ্চিম তীর থেকে ছোটোনাগপুরের মালভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত রাঢ় অঞ্চল। রাঢ় অঞ্চলটি ছিল বীরভূম জেলা। ভাগীরথীর পশ্চিম দিকে মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, মেদিনীপুর, হাওড়া ও হুগলী জেলার কিছু অংশে বাঁকুড়া জেলা অবস্থিত।

আবার অনেক মতে বঙ্ক (আঁকা বাঁকা) অপভ্রংশ থেকে এই নামের উৎপত্তি। এই রকমই অনেকটা মনে হয়। অষ্টম শতকের মল্লরাজ আদিমল্ল বা রঘুনাথ বাঁকুড়া জেলার মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ধর্মীয় জীবনের ভিত্তি গড়ে তোলেন। সেই সময় থেকে ইংরেজ আমল পর্যন্ত বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজবংশ এই অঞ্চল শাসন করে। তখন এই বিষ্ণুপুরের নাম ছিল মল্লভূম। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে বিষ্ণুপুর ইংরেজদের হাতে চলে যায়। আর এই সময় থেকে বিষ্ণুপুরের প্রাধান্য নষ্ট হতে থাকে। ১৮৩২ সালে বাঁকুড়ার পশ্চিমাঞ্চলে চুয়ার বিদ্রোহ হয়। তখন জঙ্গলমহল

ভেঙে বিষ্ণুপুর অঞ্চল বর্ধমানের অন্তর্ভুক্ত হয়। আবার ১৮৩৭ সালে বিষ্ণুপুর অঞ্চল পৃথক হয়ে বাঁকুড়াকে সদর করে পশ্চিম বর্ধমান জেলা গঠিত হয়ে বর্তমানে বাঁকুড়া জেলার জন্ম হয়।

ভূ-পরিচয় ঃ

বাঁকুড়া জেলার জঙ্গলে জীবজন্তুর সংখ্যা এখন কম। জঙ্গলে অতীতে বাঘের সংখ্যা মিলত কিন্তু এখন আর মেলে না। তাই বাঘ এর নাম অনুসরণ করে অনেক গ্রামের নামকরণ হয়েছে। যেমন -- বাঘজুড়ি, বাঘডিহা, বাঘডোবা ইত্যাদি। নেকড়ে, ভালুকের দেখা মেলে রাণিবাঁধ, শুশুনিয়া, ঝিলিমিলির জঙ্গলে। এছাড়া বুনো শুয়োর, খরগোশ, বনরুই, বাঁদর ও হনুমান রয়েছে। পাখির সংখ্যা তুলনায় কম। বাঁকুড়া জেলার উত্তরে রয়েছে জেলার প্রধান নদী দামোদর। বাঁকুড়া ও বর্ধমানের মধ্যবর্তী সীমানা চিহ্নিত করেছে এই নদী। আর জেলার দ্বিতীয় প্রধান নদী দ্বারকেশ্বর। এই নদীর উৎপত্তি পুরুলিয়ায়। এছাড়া রয়েছে কংসাবতী নদী।

অর্থনীতি ঃ

জেলার অধিকাংশ কৃষিজমি সেচের সুযোগ থেকে বঞ্চি এখনও। জেলার শতকরা ৮২ জন কৃষিজীবী। তাই কৃষিকাজ থেকেই মানুষ অর্থ উপার্জন করে বেশিরভাগ।

জেলায় প্রচুর নদনদী থাকা সত্বেও শীতের শেষে এবং গ্রীষ্মকালে জেলায় জলের অভাব অনুভূত হয়। তবে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (D.V.C.) ও কংসাবতীতে সেচপ্রকল্প শুরু হয়েছে। D.V.C. বিদ্যুৎ উৎপাদনে সেচের কাজ করে। বাঁকুড়ার অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বাঁকুড়াবাসীদের জীবিকা হিসাবে কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প বরাবরই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। তবে ইদানীং বিষ্ণুপুরের 'বালুচরি' শাড়িও নাম করেছে। এই জেলায় মাটির ঘোড়া জগৎপ্রসিদ্ধ। হাতি, ঘোড়া তৈরীর সবচেয়ে নাম করেছে তালডাংরা থানার পাঁচমুড়া। এবং শালতোড়, মেজিয়া, বড়জোড়া, গঙ্গাজলঘাটি অঞ্চলের কয়লা পাওয়া যায়। এছাড়া রাণিবাঁধ থানার ঝিলিমিলিতে অভ্র, রায়পুর অঞ্চলের চিনেমাটি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

যোগাযোগ ঃ

দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল কাছাকাছি হলেও রেল যোগাযোগ নেই বলে ওই শিল্পাঞ্চলের সুবিধা বাঁকুড়ার মানুষের কাছে বিশেষভাবে পৌঁছায় না। আবার কলকাতার সঙ্গেও রেলপথে তেমন ভালো যোগাযোগ নেই।

আকর্ষণীয় তথ্য ঃ

বিষ্ণুপুর বিখ্যাত পোড়ামাটির মন্দিরের জন্য। বিষ্ণুপুরে প্রায় ১৬টি এরূপ মন্দির আছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাসমঞ্চ, মদনমোহন মন্দির, শ্যামরায় মন্দির (পঞ্চচূড়া), ছিন্নমস্তা মন্দির ইত্যাদি। মন্দিরগুলি সবই মল্ল রাজাদের আমলে বানানো। আর আছে 'দলমাদল' কামান। প্রবাদ আছে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভক্ত রাজার রাজধানীতে বর্গী হানায় এই কামান দাগতেন।

আর কিছু তথ্য ঃ

সাঁওতালরা আসার আগে এই জেলায় বাউরী ও ব্রাহ্মণেরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। বাউরীরা এখানকার আদি অধিবাসী আর এদের মধ্যে শিক্ষিতের হার খুব কম। পৌষ সংক্রান্তিতে এদের সবচেয়ে প্রধান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বাঁকুড়ার

মানুষরা বাংলা ভাষায় কথা বলে। বাঁকুড়ার সবচেয়ে জনপ্রিয় দেবতা শিব। বিভিন্ন নামে জেলায় ছড়িয়ে আছে শিবের ক্ষেত্র। যেমন - এক্তেশ্বর, গন্ধেশ্বর, বুনোশিব, পাতালফোঁড়া ইত্যাদি। দেবীদের মধ্যে বাঁকুড়ার মনসা খুব প্রভাবশালী। শিবের গাজনের মেলা শুরু হয় ২০ই চৈত্র। মনসা পূজা ও ঝাপান বাঁকুড়ার অন্যতম উৎসব। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাঁকুড়ার সোনামুখীতে কালী, কার্ত্তিক পূজা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

পর্যটন ঃ

বাঁকুড়ার প্রধান পর্যটন কেন্দ্রগুলি হল- শুশুনিয়া, বিষ্ণুপুর, বিহারীনাথ, জয়রামবাটি, মুকুটমণিপুর ও ঝিলিমিলি।

শুশুনিয়া পাহাড়ে অনেকে পিকনিক করতে যায়। এখানে রয়েছে ঝরণা। এবং বিষ্ণুপুরের ১৬টি মন্দির রয়েছে। মন্দিরগুলি মল্লরাজাদের আমলে বানানো। জেলার সবচেয়ে উঁচু পাহাড় বিহারীনাথ, উত্তরপশ্চিম সীমান্তে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে। জয়রামবাটিতে মা সারদার জন্মস্থান। মা সারদার বাড়ির সামনে মায়ের পুকুর (কামারপুকুর) পূণ্যার্থীদের অন্যতম আকর্ষণ।

ঝিলিমিলি এই জেলার গভীর অরণ্য। রাণিবাঁধ থেকে জঙ্গলের মধ্যদিয়ে ঝিলিমিলি পৌঁছানো এক দারুণ অসাধারণ অভিজ্ঞতা। তাই সর্বশেষে একথা বলা যায় যে বাঁকুড়া জেলা হল আমাদের গর্বের বিষয়।

মজাদার জোকস

— জয় সাহা
(বি.এ., তৃতীয় বর্ষ)

১। বিচারক -- পিস্তল থাকা সত্ত্বেও ছুরি দিয়ে খুন করলে কেন তুমি তোমার স্বামীকে?
আসামী -- আমি বাচ্চাদের ঘুম ভাঙাতে চায়নি।

২। শিক্ষক-- তোমার পড়তে ভালো লাগে না?
ছাত্র -- কেন স্যার? আমি তো প্রায়ই পড়ি; কালকেও রাত্রে ঘুমোতে ঘুমোতে খাট থেকে পড়েছি।

৩। লোহার দোকানে ঢুকে এক মহিলা বলল - ঝটপট আমাকে একটা ইঁদুর ধরার খাঁচা দিন তো? আমি এক্ষুণি বাস ধরবো।
দোকানদার -- কিন্তু ইঁদুর ধরার খাঁচায় বাস ধরা যাবে না তো দিদিমুণি!

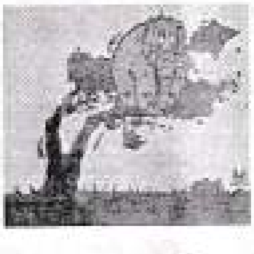

৪। কণ্ডাক্টর -- বাসে বসে সিগারেট খাওয়া নিষেধ।
যাত্রী - আমি তো সিগারেট খাচ্ছি না, আমি তো সিগারেট টানছি।

৫। ছেলে -- মা, পাশের ফ্ল্যাটের কাকিমার নাম কী ডারলিং?
মা -- কেন রে?
ছেলে -- কাল তুমি যখন ছিলে না, তখন বাবা ওকে 'ডারলিং ডারলিং' বলে আদর করছিল।

সোনামুখী কলেজ N.C.C. Unit

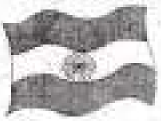

— রাহুল সাহা
A.N.O. অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ।

দেশের যুব সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৪৮ সাল থেকে আমাদের দেশের বিভিন্ন স্কুল এবং কলেজে N.C.C. Unit খোলা হয়। যার মুল উদ্দেশ্য হল একতা এবং অনুশাসন। এর ফলে শৃঙ্খলাপরায়ণ যুব সম্প্রদায় তৈরী করা সম্ভব হয়েছে যারা দেশের বিভিন্ন সেবামূলক কাজে এবং সামরিক বাহিনীতে অংশগ্রহণ করে আসছে।

আমাদের কলেজে তিন দশকের বেশি সময় ধরে N.C.C. Unit চালু আছে। এর ফলে কলেজের তরুণ ছাত্র-ছাত্রীরা শৃঙ্খলা ও অনুশাসনের মাধ্যমে কলেজ এবং সমাজকে বিভিন্নভাবে উপকৃত করে আসছে। কলেজের ছেলেমেয়েরা N.C.C. Training নিয়ে Army, Navy, Air Force, WBP, CISF, CRPF ইত্যাদি বিভিন্ন সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনীতে চাকরি করছে। এবছর হতে N.C.C. তিন বছরের পাঠক্রম চালু হয়েছে। প্রতি বছর July মাসের শেষের দিকে 54 জন ছেলেমেয়েকে উচ্চতা, শারিরীক সক্ষমতা ইত্যাদি দেখে N.C.C. তে ভর্তি করা হয়।

N.C.C. সার্টিফিকেট ঃ

মোট তিন ধরণের সার্টিফিকেট N.C.C. তে দেওয়া হয়। স্কুল স্তরে 'A' সার্টিফিকেট। কলেজ স্তরে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য 'B' ও 'C' Certificate পরীক্ষার মাধ্যমে প্রতিরক্ষামন্ত্রক দিয়ে থাকে। প্রত্যেকটি Certificate এর জন্য একসঙ্গে থিওরি ও প্র্যাক্টিক্যালে পরীক্ষায় পাশ করতে হয়। 'B' সার্টিফিকেট কোর্স পাশ করলে তবেই 'C' সার্টিফিকেট কোর্সে ভর্তি হওয়া যায়। তবে 'A' সার্টিফিটেক পাশ না কলেও কলেজস্তরে 'B' সার্টিফিকেটের প্রশিক্ষণ নেওয়া যায়।

N.C.C. -র সুযোগ-সুবিধা ঃ

N.C.C. তে ভর্ত্তি হলে যে সমস্ত সুবিধাগুলি পাওয়া যায় সেগুলি নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

১) 'C' সার্টিফিকেট হোল্ডাররা শুধুমাত্র Interview মাধ্যমেই Army, Navy এবং Air Force এ Commissioned Officer পদে যোগ দিতে পারে। তাদের লিখিত পরীক্ষায় বসতে হয় না। তবে, Degree Course এ Minimum 50% Marks থাকা আবশ্যক।

২) ORs, Sailor, Airman এর চাকরিতে 5% থেকে 10% বোনাস Marks পাওয়া যায়। এবং Military Force এ 2% থেকে 10% Bonus Marks পাওয়া যায়।

৩) রাজ্য সরকারের ও বিভিন্ন প্রাইভেট কোম্পানীর চাকরিতেও NCC 'C' সার্টিফিকেট Holder দের কিছু বিশেষ সুবিধা আছে।

৪) Adventure Training এবং বিভিন্ন Sports এ অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে Cadet দের বিশেষ সুবিধা রয়েছে।

৫) NCC Training এবং বিভিন্ন Camp এ অংশগ্রহণের মাধ্যমে আত্মবিশ্বাসী, শৃঙ্খলাপরায়ণ এবং সাহসিকতাপূর্ণ ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা সম্ভব।

সোনামুখী কলেজ ছাত্র সংসদ ২০১২-২০১৩

সভাপতি-ডঃ বিজয়কৃষ্ণ তাওরি
সহ-সভাপতি-প্রশান্ত নন্দী
সাধারণ সম্পাদক-বিশ্বজিৎ মাজি (বাপ্পা)
সহ-সাধারণ সম্পাদক-সেখ সাদ্দাম হোসেন

ছাত্র কমনরুম উপসমিতি :
যুগ্ম সম্পাদক-আকাশ ধীবর, হারাধন গোলদার
সহ-যুগ্ম সম্পাদক-ইন্দ্রজিৎ সামন্ত, শান্তনু ধারাসদস্য-শান্তনু কুণ্ডু, সুমিত কেশ, কুন্তল ঘোষ, রাহুল দত্ত, হারাধন রায়

ছাত্রী কমনরুম উপসমিতি :
যুগ্ম সম্পাদিকা-জুঁইরাণী শীঠ, পায়েল চ্যাটার্জী
সহ-যুগ্মসম্পাদিকা-জয়ন্তী দাস, প্রার্থনা ভক্ত
সদস্যা -মৌসুমী মণ্ডল, রুমা দে

ছাত্র-ছাত্রী কল্যাণ উপসমিতি (দিবা) :
যুগ্ম সম্পাদক-অনিরুদ্ধ নায়েক, রিণ্টু ঘোষস হ যুগ্ম সম্পাদক-লোকনাথ লাহা, প্রণব সরকার
সদস্য-সুমন ঘোষ, শঙ্খদীপ ব্যানার্জী

ছাত্র-ছাত্রী কল্যাণ উপসমিতি (প্রাতঃ) :
যুগ্ম সম্পাদক-সেখ সাহেব, প্রদীপ বাড়ুই
সহ যুগ্ম সম্পাদক-পরিমল ঘোষ, তাপস পাল
সদস্য-উত্তম পাল, কুশল ঘোষ
সদস্যা-প্রিয়া ঘোষ, বেলা মুর্মু

পত্রিকা উপসমিতি :
যুগ্ম সম্পাদক-পার্থ রায়, দেবাশীষ চক্রবর্তী
সহ যুগ্ম সম্পাদক-দেবব্রত ঘোষ, পরিমল ঘোষ
সদস্য-কৌশিক পাঁজা, সোমনাথ ঘোষ

সাংস্কৃতিক উপসমিতি :
যুগ্ম সম্পাদক-প্রদীপ বাড়ুই, কাশীনাথ পাঁজা
সহ যুগ্ম সম্পাদক-সুশোভন বিশ্বাস, রিণ্টু ঘোষ
সদস্য-অরূপ ঘোষ, বিনয় পান, মাণিক করেঙ্গা, সেখ কুতুবউদ্দিন মল্লিক

ক্রীড়া উপসমিতি :
যুগ্ম সম্পাদক-তাপস রজক, ইন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী
সহ যুগ্ম সম্পাদক-পথিক ডাঙ্গর, রাজু শিকদার
সদস্য-সুকদেব ঘোষ, অনুষ্টুপ কারক,
সাগর চক্রবর্তী

বিজ্ঞান পরিষদ উপসমিতি :
উপদেষ্টা-বলরাম ভট্টাচার্য্য, মিলন মণ্ডল, শুভরাজ ব্যানার্জী, সুরজিৎ ঘোষ,ও স্বরূপ ঘোষ
যুগ্ম সম্পাদক-শুভময় ঘোষ, সুমিত কর্মকার
সম্পাদিকা-পায়েল চ্যাটার্জী
সহ যুগ্ম সম্পাদক-দেবকান্ত পাল,
সেখ মহম্মদ মৌসম
সদস্য/সদস্যা-সমরেশ ধীবর, অর্জুন চক্রবর্তী, রাজেশ চ্যাটার্জী, শ্রীমন্ত ঘোষ, রাজকুমার লোহার ও সুশোভন বিশ্বাস

আমাদের দাবী

কলেজগত ঃ

১। সোনামুখী কলেজে NACC করাতে হবে।

২। কলেজে Class Room সংখ্যা আরও বাড়াতে হবে।

৩। শিক্ষাদীক্ষার মানকে উন্নয়ন করতে সকলকে যথেষ্ট যত্নবান হতে হবে।

৪। কলেজের জন্য একটি Boys' এবং Ladie's Hostel চালু করার জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫। ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত Class করানোর উপযুক্ত কাঠামোর উন্নয়ন করতে হবে।

৬। Chemistry Honours এর জন্য একটি Laboratory-এর খুবই প্রয়োজন।

৭। কলেজের দোতলায় Boys & Ladie's Toilet তৈরি করতে হবে।

৮। অনুষ্ঠানের জন্য কলেজ প্রাঙ্গণে একটি সুন্দর মঞ্চ তৈরি করতে হবে।

জেলাগত ঃ

১। শিক্ষার উন্নয়ন ও গুনগত মান বজায় রাখা।

২। শালীনদীর ব্রিজ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা দ্রুত নেওয়া।

৩। সোনামুখী শহরে একটি বাসস্ট্যাণ্ডের প্রয়োজন।

৪। সোনামুখী শহরে বাইপাস রাস্তার খুবই প্রয়োজন।

৫। Sonamukhi Hospital কে উন্নতমানের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিণত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৬। কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা।

৭। সোনামুখীতে পলিটেকনিক কলেজ স্থাপন।

ছাত্র সংসদের সাফল্য

১। College এ ২০১২-র শিক্ষাবর্ষে সমস্ত ছাত্রছাত্রীর পড়াশোনার উন্নতি ও সুবিধার জন্য নতুন বই হয়েছে ৪০০০০০ টাকা।

২। ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে Chemistry Honours. চালু করা হয়েছে।

৩। নূতন Library তৈরীর কাজ চালু হয়েছে।

৪। নতুন Boys' Toilet তৈরী হয়েছে।

৫। College এর সামনে দুটি সুন্দর বাগান যা সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেছে।

৬। সমস্ত সাম্মানিক বিভাগে সিট সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে।

৭। Physical Education ও Education Subject চালু হয়েছে।

৮। কলেজের পঠন-পাঠন এবং ছাত্রছাত্রীর পরিষেবা উন্নত হচ্ছে।

৯। কলেজের সামনে সাইকেল স্ট্যাণ্ড চালু।

১০। কলেজ হেলথ্ সেন্টার চালু।

১১। কলেজ নিরাপত্তা রক্ষী কর্মী দেওয়া হয়েছে।

১২। কলেজে নতুন গেট তৈরী হয়েছে।

১৩। কলেজে নতুন ক্যান্টিন চালু হয়েছে।

১৪। কলেজের দোতলায় পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।১

> নতুন ভারত যারা সৃষ্টি করতে চায়, তাদের কেবল দিয়ে যেতে হবে, -- নিজেকে বিলিয়ে কাঙাল হয়ে যেতে হবে - প্রতিদানে কিছু না চেয়ে।
>
> -- সুভাষচন্দ্র বোস

Tree plant

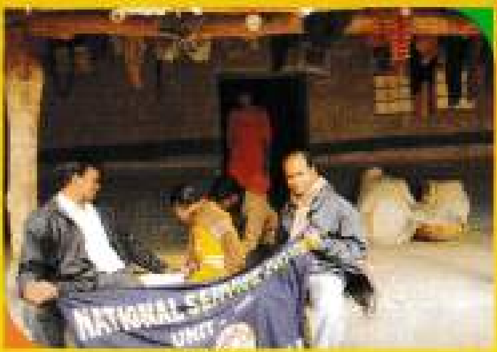

NSS survey

NSS unit 1

NSS sports

NSS unit 2

NSS sports prize distribution

NSS unit 3

NSS claening

Printed At : Sreema Printers'
Sonamukhi, College Road, Bankura, Mob.- 9851440125